ভূগোল ও পরিবেশ

নবম-দশম শ্রেণি

প্রথম অধ্যায়

ভূগোল ও পরিবেশ

ভূগোল:

- ইংরেজি ‘Geography’ শব্দটি থেকে ভূগোল শব্দ এসেছে।
- প্রাচীন গ্রিসের ভূগোলবিদ ইরাটসথেনিস প্রথম ‘Geography’ শব্দ ব্যবহার করেন।
- ‘Geo’ ও ‘Graphy’ শব্দ দুটি মিলে হয়েছে ‘Geography’। ‘Geo’ শব্দের অর্থ ‘ভূ’ বা পৃথিবী এবং ‘Graphy’ শব্দের অর্থ বর্ণনা। সুতরাং ‘Gepgraphy’ শব্দটির অর্থ পৃথিবীর বর্ণনা।
- ভূগোল একদিকে প্রকৃতির বিজ্ঞান আবার অন্যদিকে পরিবেশ ও সমাজের বিজ্ঞান।
- অধ্যাপক ডাডলি স্ট্যাম্পের মতে, পৃথিবী ও এর অধিবাসীদের বর্ণনাই হলো ভূগোল।
- অধ্যাপক কার্ল রিটার ভূগোলকে বলেছেন পৃথিবীর বিজ্ঞান।

পরিবেশের ধারণা

- পরিবেশ বিজ্ঞানী আর্মসের মতে, জীবসম্প্রদায়ের পারিপার্শ্বিক জৈব ও প্রাকৃতিক অবস্থাকে পরিবেশ বলে।
- পার্ক (C. C. Park) বলেছেন, পরিবেশ বলতে স্থান ও কালের কোনো নির্দিষ্ট বিন্দুতে মানুষকে ঘিরে থাকা সকল অবস্থার যোগফল বোঝায়।

পরিবেশের উপাদান :

পরিবেশের উপাদান দুই প্রকার: যেমন জড় উপাদান ও জীব উপাদান।

পরিবেশের প্রকারভেদ :

পরিবেশ দুই প্রকার: ভৌত বা প্রাকৃতিক পরিবেশ ও সামাজিক পরিবেশ।

ভূগোল প্রকারভেদ :

পূর্বে ভূগোলকে প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করা হতো: (১) প্রাকৃতিক ভূগোল ও (২) মানবিক ভূগোল।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মহাবিশ্ব ও আমাদের পৃথিবী

মহাকাশ ও মহাবিশ্ব

আদি-অন্তহীন এ আকাশকে মহাকাশ বলে।মহাকাশে অসংখ্য জ্যোতিষ্ক রয়েছে।এরা সুশৃঙ্খলভাবে নিজস্ব কক্ষপথে নির্দিষ্ট গতিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে।এসব নক্ষত্র এবং এদের গ্রহ ও উপগ্রহকে বলে জ্যোতিষ্ক।এদের মধ্যে কোনো কোনোটার আলো আছে আবার কোনো কোনোটার আলো নেই।বর্তমানে চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, ধূমকেতু, উল্কা, নীহারিকা, পালসার, কৃষ্ণবামন (Black Dwarf), কৃষ্ণগহ্বর (Black Hole) প্রভৃতি সবকিছুকেই জ্যোতিষ্ক বলে।এদের সবাইকে নিয়ে গঠিত হয়েছে মহাবিশ্ব।

নক্ষত্র (Stars)

- যেসব জ্যোতিষ্কের নিজের আলো আছে তাদের নক্ষত্র বলে।
- নক্ষত্রগুলো হলো জ্বলন্ত গ্যাসপিণ্ড, এরা হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম গ্যাস দিয়ে তৈরি।
- পৃথিবী ও নক্ষত্রদের মধ্যে এবং নক্ষত্রদের পরস্পরের মধ্যে দূরত্ব এত বেশি যে কিলোমিটার দ্বারা এই দূরত্ব প্রকাশ করা যায় না।এই দূরত্ব আলোক বর্ষ এককে মাপা হয়।আলো প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ৩ লক্ষ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে।এই বেগে ১ বছরে যে পরিমাণ দূরত্ব অতিক্রম করে তাকে ১ আলোক বর্ষ বলে।
- সূর্য থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে সময় লাগে ৮ মিনিট ১৯ সেকেন্ড।
- সুতরাং পৃথিবী ও সূর্যের মধ্যবর্তী দূরত্ব প্রায় ১৫ কোটি কিলোমিটার।
- সূর্য পৃথিবীর নিকটতম নক্ষত্র।
- সূর্যের নিকটতম নক্ষত্র প্রক্সিমা সেন্টোরাই (Proxima Centauri)। পৃথিবী থেকে এর দূরত্ব প্রায় ৪.২ আলোক বর্ষ যা প্রায় ৮ লক্ষ কোটি কিলোমিটারের সমান।

নক্ষত্রমণ্ডলী (Constellation) : মেঘমুক্ত অন্ধকার রাতে আকাশের দিকে তাকালে মনে হয় কয়েকটি নক্ষত্র বিশেষ আকৃতিতে মিলে জোট বেঁধেছে।এভাবে আমাদের পরিচিত আকৃতিতে নক্ষত্রদলকে নক্ষত্রমণ্ডলী বলে।

গ্যালাক্সি (Galaxy): মহাকাশে গ্রহ, নক্ষত্র, ধূলিকণা, ধূমকেতু বাষ্পকুণ্ডের এক বিশাল সমাবেশকে গ্যালাক্সি বা নক্ষত্র জগৎ বলে।
কোনো একটি গ্যালাক্সির ক্ষুদ্র অংশকে ছায়াপথ বলে।

নীহারিকা (Nebula) : নীহারিকা হলো মহাকাশে অসংখ্য স্বল্পালোকিত তারকার আস্তরণ।এদের আকার বিচিত্র।কিছু নীহারিকার দেহ গ্যাসীয় পদার্থে পূর্ণ।এদেরকে গ্যাসীয় নীহারিকা বলে।

ছায়াপথ (Milky Way) : কোনো একটি গ্যালাক্সির ক্ষুদ্র অংশকে ছায়াপথ বা আকাশ গঙ্গা বলে। একটি ছায়াপথ লক্ষ কোটি নক্ষত্রের সমষ্টি। সৌরজগৎ এরকম একটি ছায়াপথের অন্তর্গত।

উল্কা (Meteor) : রাতের মেঘমুক্ত আকাশে অনেক সময় মনে হয় যেন নক্ষত্র ছুটে যাচ্ছে বা মনে হয় কোনো নক্ষত্র যেন এই মাত্র খসে পড়ল।এই ঘটনাকে নক্ষত্রপতন বা তারা খসা বলে।এরা কিন্তু আসলে কোনো নক্ষত্র নয়, এদের নাম উল্কা।

ধূমকেতু (Comet) : মহাকাশে মাঝে মাঝে একপ্রকার জ্যোতিষ্কের আবির্ভাব ঘটে।এদের একটি মাথা ও একটি লেজ আছে।এসব জ্যোতিষ্ককে ধূমকেতু বলে। জ্যোতির্বিজ্ঞানী এডমন্ড হ্যালি যে ধূমকেতু আবিষ্কার করেন তা হ্যালির ধূমকেতু নামে পরিচিত।হ্যালির ধূমকেতু প্রতি ৭৬ বছরে একবার দেখা যায়।১৭৫৯, ১৮৩৫, ১৯১০ ও ১৯৮৬ সালে হ্যালির ধূমকেতু দেখা গেছে।

গ্রহ (Planet) : মহাকাশে কতকগুলো জ্যোতিষ্ক সূর্যকে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট পথে পরিক্রমণ করে।এদের নিজেদের কোনো আলো বা তাপ নেই।মহাকর্ষ বলের প্রভাবে এরা সূর্যকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়।এরা সূর্য থেকে আলো ও তাপ পায়। এরা তারার মতো মিটমিট করে জ্বলে না।এসব জ্যোতিষ্ককে গ্রহ বলে।আমাদের সৌরজগতের আটটি গ্রহ হলো পৃথিবী, মঙ্গল, বুধ, শনি, বৃহস্পতি, শুক্র, ইউরেনাস ও নেপচুন।

উপগ্রহ (Satelite) : কিছু কিছু জ্যোতিষ্ক গ্রহকে ঘিরে আবর্তিত হয়, এদের উপগ্রহ বা চাঁদ বলে।মহাকর্ষ বলের প্রভাবে এরা গ্রহকে কেন্দ্র করে ঘোরে।এদের নিজস্ব আলো বা তাপ নেই।এরা সূর্য বা নক্ষত্র থেকে আলো বা তাপ পায়।চাঁদ পৃথিবী গ্রহের একমাত্র উপগ্রহ। বুধ ও শুক্রের কোনো উপগ্রহ নেই। শনির উপগ্রহ সংখ্যায় সবচেয়ে বেশি। টাইটান শনি গ্রহের সবচেয়ে বড় উপগ্রহ।

সৌরজগৎ (Solar System): সূর্য এবং তার গ্রহ, উপগ্রহ, গ্রহাণুপুঞ্জ, অসংখ্য ধূমকেতু ও অগণিত উল্কা নিয়ে সৌরজগৎ গঠিত সূর্য একটি নক্ষত্র এবং চাঁদ একটি উপগ্রহ।

সূর্য (Sun) : সূর্য একটি নক্ষত্র।এটি একটি মাঝারি আকারের হলুদ বর্ণের নক্ষত্র।এর ব্যাস প্রায় ১৩ লক্ষ ৮৪ হাজার ১৩ কিলোমিটার এবং ভর প্রায় ১.৯৯X১০১৩ কিলোগ্রাম। পৃথিবী, অন্যান্য গ্রহ, উপগ্রহের তাপ ও আলোর মূল উৎস সূর্য। সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘুরছে আটটি গ্রহ।সূর্য থেকে গ্রহগুলো দূরত্ব অনুযায়ী পরপর যেভাবে রয়েছে তা হলো বুধ(Mercury), শুক্র (Venus), পৃথিবী (Earth), মঙ্গল (Mars), বৃহস্পতি (Jupiter), শনি (Saturn), ইউরেনাস (Uranus) এবং নেপচুন (Neptune)। গ্রহদের মধ্যে সবচেয়ে বড় বৃহস্পতি এবং ছোট বুধ। বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি বেশ উজ্জ্বল এবং কোনো যন্ত্রের সাহায্য ছাড়াই দেখা যায়।

বুধ (Mercury) : বুধ সৌরজগতের ক্ষুদ্রতম এবং সূর্যের নিকটতম গ্রহ। সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করে আসতে বুধের সময় লাগে ৮৮ দিন।সুতরাং বুধ গ্রহে ৮৮ দিনে ১ বছর হয়।বুধের মাধ্যাকর্ষণ বল এত কম যে এটি কোনো বায়ুমণ্ডল ধরে রাখতে পারে না।এখানে নেই মেঘ, বৃষ্টি, বাতাস ও পানি।সুতরাং প্রাণীর অস্তিত্ব নেই। বুধের কোনো উপগ্রহ নেই।

শুক্র (Venus) : বুধের মতো শুক্র গ্রহকেও ভোরের আকাশে শুকতারা এবং সন্ধ্যার আকাশে সন্ধ্যাতারা হিসেবে দেখা যায়।শুকতারা বা সন্ধ্যাতারা আসলে কোনো তারা নয়। এটি সৌরজগতের সবচেয়ে উজ্জ্বল ও সবচেয়ে উত্তপ্ত গ্রহ। এর দিন ও রাতের মধ্যে আলোর বিশেষ কোনো তারতম্য হয় না।এখানে বৃষ্টি হয় তবে এসিড বৃষ্টি। **(35 Preli)**

পৃথিবী (Earth) : এটি সূর্যের তৃতীয় নিকটতম গ্রহ।সূর্য থেকে পৃথিবীর গড় দূরত্ব ১৫ কোটি কিলোমিটার।এর ব্যাস প্রায় ১২,৬৬৭ কিলোমিটার।পৃথিবী একবার সূর্যকে প্রদক্ষিণ করতে সময় নেয় ৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট ৪৭ সেকেন্ড।তাই এখানে ৩৬৫ দিনে ১ বছর।চাঁদ পৃথিবীর একমাত্র উপগ্রহ।

মঙ্গল (Mars) : মঙ্গল পৃথিবীর নিকটতম প্রতিবেশী।বছরের অধিকাংশ সময় একে দেখা যায়।খালি চোখে মঙ্গল গ্রহকে লালচে দেখায়। এই গ্রহে দিনরাত্রির পরিমাণ পৃথিবীর প্রায় সমান।সূর্যের চারদিকে একবার ঘুরতে মঙ্গলের সময় লাগে ৬৮৭ দিন।
এ গ্রহে অক্সিজেন ও পানির পরিমাণ খুবই কম এবং কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ এত বেশি (শতকরা ৯৯ ভাগ) যে প্রাণীর অস্তিত্ব থাকা সম্ভব নয়।

বৃহস্পতি (Jupiter) : বৃহস্পতি সৌরজগতের সবচেয়ে বড় গ্রহ।একে গ্রহরাজ বলে।বৃহস্পতির বায়ুমণ্ডল হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম গ্যাস দিয়ে তৈরি।

শনি (Saturn) : শনি সৌরজগতের দ্বিতীয় বৃহত্তম গ্রহ।শনির ভূত্বক বরফে ঢাকা। শনিকে ঘিরে রয়েছে হাজার হাজার বলয় যা বরফ, ধূলিকণা ও শিলা দিয়ে তৈরি।এ বলয়ের এক একটা এক এক রঙের।তাই শনি এত সুন্দর।

ইউরেনাস (Uranus) : ইউরেনাস সৌরজগতের তৃতীয় বৃহত্তম গ্রহ।

নেপচুন (Neptune) : সূর্য থেকে এর দূরত্ব প্রায় ৪৫০ কোটি কিলোমিটার।এখানে সূর্যের আলো ও তাপ খুব কম।এ

পৃথিবীর আকার-আকৃতি

মহাকাশচারী ইউরি গ্যাগারিন ১৯৬১ সালের ১২ই এপ্রিল স্পুটনিকে চড়ে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণের সময় বুঝতে পারেন পৃথিবী 'গোলাকার' তবে উত্তর-দক্ষিণে কিছুটা চাপা। পৃথিবীর প্রকৃত আকৃতি হলো অনেকটা 'অভিগত গোলকের' (Oblate Spheriod) মতো।

- পৃথিবীর আকৃতি যেহেতু সম্পূর্ণ গোলাকার নয় সেহেতু পৃথিবীর নিরক্ষীয় 'পূর্ব-পশ্চিম' ব্যাস ও মেরুদেশীয় 'উত্তর-দক্ষিণ' ব্যাস ভিন্ন।মেরুদেশীয় ব্যাস হলো ১২,৭১৪ কিলোমিটার এবং নিরক্ষীয় ব্যাস হলো ১২,৭৫৭ কিলোমিটার।এদের মধ্যে পার্থক্য হলো ৪৩ কিলোমিটার।
- পৃথিবীর গড় ব্যাস হলো ১২,৭৩৪.৫ কিলোমিটার।গণনার সুবিধার জন্য একে ১২,৮০০ কিলোমিটার ধরা হয়।
- এই হিসেবে পৃথিবীর গড় ব্যাসার্ধ হলো ৬,৪০০ কিলোমিটার।
- পৃথিবীর পরিধির মধ্যে নিরক্ষীয় পরিধি ৪০,০৭৭ কিলোমিটার।এটাই সর্ববৃহৎ পরিধি এবং মেরুদেশীয় পরিধি ৪০,০০৯ কিলোমিটার।গণনার সুবিধার জন্য গড় পরিধি ৪০,০০০ কিলোমিটার ধরা হয়।

অক্ষরেখা, দ্রাঘিমারেখা ও গুরুত্বপূর্ণ রেখাসমূহ : (Latitute, Longitude and other Important Lines)

সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে কোনো একটি স্থানকে নির্দিষ্ট করতে হলে বা এর অবস্থান জানতে হলে আমাদের সবার আগে যে বিষয়গুলো জানতে হবে তা হলো অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমারেখা। অক্ষরেখার সাহায্যে যেমন নিরক্ষরেখা থেকে উত্তর বা দক্ষিণে অবস্থান জানা যায় তেমনি মূল মধ্যরেখা থেকে পূর্ব বা পশ্চিমে অবস্থান জানা যায়।

অক্ষরেখা : পৃথিবীর গোলাকৃতি কেন্দ্র দিয়ে উত্তর-দক্ষিণে কল্পিত রেখাকে অক্ষ বা মেরুরেখা বলে। এই অক্ষের উত্তর-প্রান্ত বিন্দুকে উত্তর মেরু বা সুমেরু এবং দক্ষিণ-প্রান্ত বিন্দুকে দক্ষিণ মেরু বা কুমেরু বলে।

নিরক্ষরেখা বা বিষুবরেখা: দুই মেরু থেকে সমান দূরত্বে পৃথিবীকে পূর্ব-পশ্চিমে বেষ্টন করে একটি রেখা কল্পনা করা হয়েছে।একে নিরক্ষরেখা বা বিষুবরেখা বলে।নিরক্ষরেখার উত্তর-দক্ষিণে পৃথিবীকে সমান দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে।নিরক্ষরেখার উত্তর দিকের পৃথিবীর অর্ধেককে উত্তর গোলার্ধ ও দক্ষিণ দিকের অর্ধেককে দক্ষিণ গোলার্ধ বলে।এই নিরক্ষরেখাকে ০০ ধরে উত্তর দিকে ও দক্ষিণ দিকে দুই মেরু পর্যন্ত ৯০০ বা এক সমকোণ ধরা হয়।পৃথিবীর গোলীয় আকৃতির জন্য নিরক্ষরেখা বৃত্তাকার, তাই এ রেখাকে নিরক্ষবৃত্তও বলে। বিষুবরেখাকে মহাবৃত্ত বা গুরুবৃত্ত বলে।

অক্ষাংশ:নিরক্ষরেখা থেকে উত্তর বা দক্ষিণে অবস্থিত কোনো স্থানের কৌণিক দূরত্বকে ঐ স্থানের অক্ষরেখা বলে।অক্ষরেখার ডিগ্রিকে অক্ষাংশ বলে।

অক্ষাংশ নির্ণয়: অক্ষাংশ নির্ণয়ের বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে।সেগুলো হলো-

১।সেক্সট্যান্ট যন্ত্রের সাহায্যে : যে যন্ত্রের সাহায্যে সূর্যের উন্নতি পরিমাপ করা যায় তাকে সেক্সট্যান্ট যন্ত্র বলে।

২।ধ্রুবতারার সাহায্যে অক্ষাংশ নির্ণয়

কয়েকটি সমাক্ষরেখা খুব বিখ্যাত:

- ২৩.৫০ উত্তর অক্ষাংশকে বলে কর্কটক্রান্তি।
- ২৩.৫০ দক্ষিণ অক্ষাংশকে বলে বলে মকরক্রান্তি।
- ৬৬.৫০ উত্তর অক্ষাংশকে বলে সুমেরুবৃত্ত এবং
- ৬৬.৫০ দক্ষিণ অক্ষাংশকে বলে কুমেরুবৃত্ত।
- পৃথিবী বৃত্তের কেন্দ্রে উৎপন্ন কোণ ৩৬০০ ।

দ্রাঘিমারেখা (Meridians of Longitude): নিরক্ষরেখাকে ডিগ্রি, মিনিট ও সেকেন্ডে ভাগ করে প্রত্যেক ভাগবিন্দুর উপর দিয়ে উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত যে সকল রেখা কল্পনা করা হয়েছে সেগুলোই হলো দ্রাঘিমারেখা।দ্রাঘিমারেখাকে মধ্যরেখাও বলে।এ রেখাগুলো পৃথিবীর পরিধির অর্ধেকের সমান।অর্থাৎ এক-একটি অর্ধবৃত্ত।

যুক্তরাজ্যের লন্ডন শহরের কাছে গ্রিনিচ (Greenwich) মান মন্দিরের উপর দিয়ে উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত বি¯তৃত যে মধ্যরেখা অতিক্রম করেছে তাকে মূল মধ্যরেখা বলে।গ্রিনিচের দ্রাঘিমা ০০ ।গ্রিনিচের মূল মধ্যরেখা থেকে পূর্ব বা পশ্চিমে কোনো স্থানের কৌণিক দূরত্বকে ঐ স্থানের দ্রাঘিমা বলে।

দ্রাঘিমা নির্ণয় :

দ্রাঘিমা নির্ণয়ের দুটি পদ্ধতি রয়েছে।

১।স্থানীয় সময়ের পার্থক্য ও

২।গ্রিনিচের সময় দ্বারা।

১।স্থানীয় সময়ের পার্থক্য : কোনো স্থানে মধ্যাহ্নে যখন সূর্য ঠিক মাথার উপর আসে সেখানে দুপুর ১২টা ধরে প্রতি ৪ মিনিট সময়ের পার্থক্যে দ্রাঘিমার পার্থক্য হয় ১০ ।

২।গ্রিনিচের সময় দ্বারা : গ্রিনিচের দ্রাঘিমা শূন্য ডিগ্রি (০০) ধরা হয়।এখন আমরা যদি গ্রিনিচের সময় এবং অন্য কোনো স্থানের সময় জানতে পারি তাহলে দুই স্থানের সময়ের পার্থক্য অনুসারে প্রতি ৪ মিনিট সময়ের পার্থক্যে ১০ দ্রাঘিমার পার্থক্য ধরে ঐ স্থানের দ্রাঘিমা নির্ণয় করতে পারি।গ্রিনিচের পূর্ব দিকের দেশগুলো সময়ের হিসেবে গ্রিনিচের চেয়ে এগিয়ে থাকে এবং গ্রিনিচের পশ্চিমে অবস্থিত দেশগুলোর সময় গ্রিনিচের সময় থেকে পিছিয়ে থাকে।বাংলাদেশ গ্রিনিচ থেকে ৯০০ পূর্বে অবস্থিত বলে বাংলাদেশের সময় ৬ ঘণ্টা এগিয়ে।

গুরুত্বপূর্ণ রেখাসমূহ :

নিরক্ষরেখা : পৃথিবীর ঠিক মাঝখান দিয়ে যে রেখাটি পূর্ব-পশ্চিমে পুরো পৃথিবীকে বেষ্টন করে আছে তাকে নিরক্ষরেখা বলে।

কর্কটক্রান্তি ও মকরক্রান্তি রেখা : উত্তর গোলার্ধে ২৩.৫০ উত্তর অক্ষরেখাকে কর্কটক্রান্তি রেখা এবং দক্ষিণ গোলার্ধে ২৩.৫০ দক্ষিণ অক্ষরেখাকে মকরক্রান্তি রেখা বলে। আমাদের বাংলাদেশের উপর দিয়ে কর্কটক্রান্তি রেখা অতিক্রম করেছে।

সুমেরু ও কুমেরুবৃত্ত : উত্তর গোলার্ধে ৬৬.৫০ উত্তর অক্ষরেখাকে সুমেরুবৃত্ত এবং ৬৬.৫০ দক্ষিণ অক্ষরেখাকে কুমেরুবৃত্ত বলে

আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা (International Date Line)

- দ্রাঘিমারেখার নিয়মানুসারে মূল মধ্যরেখা থেকে পূর্ব ও পশ্চিমে অগ্রসর হলে প্রতি ১০ দ্রাঘিমার পার্থক্যের জন্য ৪ মিনিট সময়ের ব্যবধান হয়। যেহেতু প্রতি ১০ -এর জন্য ৪ মিনিট সেহেতু ১৮০০ -এর জন্য ১৮০ X ৪ = ৭২০ মিনিট অর্থাৎ ১২ ঘণ্টার পার্থক্য হয়।এভাবে দুই দিকে, পূর্ব ও পশ্চিম দিকে ১২ ঘণ্টা করে ২৪ ঘণ্টার ব্যবধান হয়।পূর্ব দিকে গেলে ১২ ঘণ্টা বাড়ে আর পশ্চিম দিকে গেলে ১২ ঘণ্টা কমে অর্থাৎ একই দ্রাঘিমায় ১৮০০ তে সময়ের ব্যবধান দেখা দেয় ২৪ ঘণ্টা।
- তারিখ ও বারের যে সমস্যা হয় তার সমাধানকল্পে ১৮৮৪ সালে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনে 'দ্রাঘিমা ও সময়' সম্পর্কিত এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ১৮০০ দ্রাঘিমারেখাকে আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা হিসেবে স্থির করা হয়
- পৃথিবীর মানচিত্রে প্রশান্ত মহাসাগরের উপর দিয়ে ১৮০০ দ্রাঘিমা অনুসরণ করে আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা প্রবর্তন করা হয়েছে।

গ্রিনিচে ১৬ই ডিসেম্বর সকাল ৬টা হলে আমরা যদি পূর্ব দিকের সময় হিসাব করি তাহলে যখন ১৮০০ পূর্ব দ্রাঘিমায় আসব তখন সেখানে সময় হবে ১৬ই ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৬টা। ঠিক উল্টো দিকে পশ্চিমে ১৮০০ তে আসলে সেখানে ১৫ই ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৬টা হবে।কারণ পূর্ব দিকে সময় বাড়ে আর পশ্চিম দিকে সময় কমে।পশ্চিমগামী জাহাজ আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা অতিক্রমকালে ঘড়ির সময় একদিন বাড়িয়ে অর্থাৎ সেদিন সোমবার থাকলে তাকে মঙ্গলবার করা হয়।আর জাহাজ যদি পূর্ব দিকে যায় তাহলে একদিন বিয়োগ করতে হয়।

১৮০০ দ্রাঘিমারেখা পৃথিবীর পশ্চিম বা পূর্ব গোলার্ধের তারিখ বিভাজিকার (Date Line Divider) কাজ করে।এজন্যই ১৮০০ দ্রাঘিমারেখাকে আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা বলে আন্তর্জাতিক তারিখ রেখাকে কোথাও কোথাও বাঁকিয়ে দেওয়া হয়েছে। কারণ এ রেখাকে ১৮০০ দ্রাঘিমারেখা অনুসরণ করে প্রশান্ত মহাসাগরের উপর দিয়ে টানা হলেও সাইবেরিয়ায় উত্তর-পূর্বাংশ এবং অ্যালিউশিয়ান, ফিজি এবং চ্যাথাম দ্বীপপুঞ্জের স্থলভাগকে এড়িয়ে চলার জন্য এই রেখাটিকে অ্যালিউসিয়ান দ্বীপপুঞ্জের কাছে এবং ফিজি ও চ্যাথাম দ্বীপপুঞ্জে ১১০ পূর্ব দিয়ে বেঁকে এবং বেরিং প্রণালিতে ১২০ পূর্বে বেঁকে শুধু পানির উপর দিয়ে টানা হয়েছে। তা না হলে স্থানীয় অধিবাসীদের বার নির্ণয় করতে অসুবিধা হতো।কারণ একই স্থানের মধ্যেই সময় এবং বার দুইরকম হতো।

প্রতিপাদ স্থান : আমরা জানি পৃথিবী গোল তাই এর কোনো একটি স্থানের বিপরীত দিকে অন্য কোনো একটি স্থান রয়েছে।ভূপৃষ্ঠের কোনো বিন্দু থেকে পৃথিবীর কোনো কল্পিত ব্যাস ভূকেন্দ্র ভেদ করে অপরদিকে ভূপৃষ্ঠকে যে বিন্দুতে স্পর্শ করে সেই বিন্দুকে প্রথম বিন্দুটির প্রতিপাদ স্থান বলে

আহ্নিক ও বার্ষিক গতি (Diurnal and Annual Motion) :সূর্য স্থির এবং পৃথিবীই সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘুরছে।পৃথিবী শুধু সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘোরে না, নিজ অক্ষ বা মেরুরেখার উপরও আবর্তন করে।পৃথিবীর গতি দুপ্রকার।নিজ অক্ষের উপর একদিনে আবর্তন করাকে আহ্নিক গতি (Diurnal Motion) এবং কক্ষপথে একবছরে সূর্যকে পরিক্রমণ করাকে বার্ষিক গতি (Annual Motion) বলে।

আহ্নিক গতি : পৃথিবী তার নিজের মেরুদণ্ডের বা অক্ষের চারদিকে দিনে একবার নির্দিষ্ট গতিতে পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে আবর্তন করে।পৃথিবীর এই আবর্তন গতিকে দৈনিক গতি বা আহ্নিক গতি বলে।পৃথিবী তার নিজের মেরুদণ্ডের উপর একবার পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে আবর্তন করতে সময় নেয় ২৩ ঘণ্টা ৫৬ মিনিট ৪ সেকেন্ড বা ২৪ ঘণ্টা অর্থাৎ একদিন।একে সৌরদিন বলে।

পৃথিবীর আহ্নিক গতি বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম।পৃথিবীপৃষ্ঠ পুরোপুরি গোল না হওয়ায় এর পৃষ্ঠ সর্বত্র সমান নয়।সে কারণে পৃথিবীপৃষ্ঠের সকল স্থানের আবর্তন বেগও সমান নয়।নিরক্ষরেখায় পৃথিবীর পরিধি সবচেয়ে বেশি।এজন্য নিরক্ষরেখায় পৃথিবীর আবর্তনের বেগ সবচেয়ে বেশি।ঘণ্টায় প্রায় ১৭০০ কিলোমিটার।ঢাকায় পৃথিবীর আহ্নিক গতির বেগ ১৬০০ কিলোমিটার।যত মেরুর দিকে যাবে এ আবর্তনের বেগ তত কমতে থাকে

আহ্নিক গতির ফল:

১।পৃথিবীতে দিবারাত্রি সংঘটন
২।জোয়ার-ভাটা সৃষ্টি
৩।বায়ুপ্রবাহ ও সমুদ্রস্রোতের সৃষ্টি
৪।তাপমাত্রার তারতম্যের সৃষ্টি
৫।সময় গণনা বা সময় নির্ধারণ
৬।উদ্ভিদ ও প্রাণিজগৎ সৃষ্টি

পৃথিবীর বার্ষিক গতি:

সূর্যের মহাকর্ষ বলের আকর্ষণে পৃথিবী নিজের অক্ষের উপর অবিরাম ঘুরতে ঘুরতে একটি নির্দিষ্ট পথে নির্দিষ্ট দিকে (ঘড়ির কাঁটার বিপরীতে) এবং নির্দিষ্ট সময়ে সূর্যের চারদিকে ঘুরছে।পৃথিবীর এই গতিকে বার্ষিক গতি (Annual Motion) বা পরিক্রমণ গতি (Revolution Motion) বলে।

একবার সূর্যকে পূর্ণ পরিক্রমণ করতে পৃথিবীর সময় লাগে ৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট ৪৭ সেকেন্ড।একে সৌরবছর বলে।কিন্তু আমরা ৩৬৫ দিনকে এক বছর ধরি।এতে প্রতি বছর প্রায় ৬ ঘণ্টা অতিরিক্ত থেকে যায়।এ অতিরিক্ত সময়ের সামঞ্জস্য আনার জন্য প্রতি ৪ বছর অন্তর ফেব্রুয়ারি মাসে ২৪ ঘণ্টা বা ১ দিন বাড়িয়ে সময়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রাখা হয়।এভাবে যে বছর ফেব্রুয়ারি মাসকে ১ দিন বাড়িয়ে ২৯ দিন করা হয় এবং ঐ বছরটিকে ৩৬৬ দিন ধরা হয়।সেই বছরকে লিপ ইয়ার বা অধিবর্ষ বলে।সাধারণত কোনো বছরকে ৪ দিয়ে ভাগ করলে যদি ভাগশেষ না থাকে তবে ঐসব বছরকে অধিবর্ষ বা লিপ ইয়ার (Leap Year) ধরা হয়।

বার্ষিক গতির ফল:

(১) দিবারাত্রির হ্রাস-বৃদ্ধি,
(২) ঋতু পরিবর্তন হওয়া।

১।দিবারাত্রির হ্রাস-বৃদ্ধির প্রকৃত কারণ :

(ক) পৃথিবীর অভিগত গোলাকৃতি
(খ) পৃথিবীর উপবৃত্তাকার কক্ষপথ
(গ) পৃথিবীর অবিরাম আবর্তন ও পরিক্রমণ গতি
(ঘ) পৃথিবীর মেরুরেখার সর্বদা একই মুখে অবস্থান
(ঙ) পৃথিবীর কক্ষপথে কৌণিক অবস্থান।

কর্কটসংক্রান্তি: ২১শে মার্চ সূর্য নিরক্ষরেখার উপর লম্বভাবে কিরণ দেয়।এরপর ধীরে ধীরে সূর্যের কিরণ উত্তর গোলার্ধের দিকে যেতে থাকে।উত্তর গোলার্ধে ২১শে জুন দীর্ঘতম দিন ও ক্ষুদ্রতম রাত হয়।২১শে জুন সূর্য উত্তরায়ণের শেষ সীমায় পৌঁছায়, একে কর্কটসংক্রান্তি বলে।

মকরসংক্রান্তি: ২৩শে সেপ্টেম্বর পুনরায় ২১শে মার্চের মতো সূর্য নিরক্ষরেখার উপর লম্বভাবে কিরণ দেয়।সেদিন সর্বত্র দিবারাত্রি সমান থাকে।২৩শে সেপ্টেম্বর থেকে আবার সূর্য দক্ষিণ গোলার্ধের দিকে কিরণ বেশি দিতে থাকে।২২শে ডিসেম্বর এমনভাবে কোণ করে থাকে তাতে দক্ষিণ গোলার্ধে সবচেয়ে বড় দিন এবং উত্তর গোলার্ধে সবচেয়ে ছোট দিন হয়।২২শে ডিসেম্বর সূর্য দক্ষিণায়নের শেষ সীমায় পৌঁছায়, একে মকরসংক্রান্তি বলে।

বিষুব - দিবারাত্রি সমান :

- ২১শে মার্চ এবং ২৩শে সেপ্টেম্বর নিরক্ষরেখার উপর সূর্য লম্বভাবে কিরণ দেয়।এই দুদিন পৃথিবীর সর্বত্র দিবারাত্রি সমান হয়।সেদিনকে বিষুব (Equinox) বলে।
- ২১শে মার্চ উত্তর গোলার্ধে বসন্তকাল তাই একে বাসন্ত বিষুব (Vernal equinox) বলে।
- ২৩শে সেপ্টেম্বর উত্তর গোলার্ধে শরৎকাল।তাই ঐ দিনকে শারদ বিষুব (Autumnal equinox) বলে।

বার্ষিক গতির প্রমাণ

১।রাতের আকাশে নক্ষত্রদের স্থান পরিবর্তন, অন্তর্ধান ও পুনরাগমন :
২।আকাশে সূর্যের পরিবর্তিত অবস্থান
৩।বিভিন্ন গ্রহের পরিক্রমণ গতি
৪।প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা
৫।মহাকর্ষ সূত্র

ঋতু পরিবর্তনের কারণ ও প্রভাব

তাপমাত্রার পার্থক্য অনুসারে সারা বছরকে চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে।এগুলো হলো- গ্রীষ্মকাল, শরৎকাল, শীতকাল ও বসন্তকাল।আমরা জানি, পুরো পৃথিবীকে দুটো গোলার্ধে ভাগ করা হয়েছে।নিরক্ষরেখার উপরের দিকের অংশকে উত্তর গোলার্ধ এবং নিচের দিকের অংশকে দক্ষিণ গোলার্ধ ধরা হয়।উত্তর গোলার্ধে যখন গ্রীষ্মকাল দক্ষিণ গোলার্ধে তখন শীতকাল।আবার উত্তর গোলার্ধে যখন শীতকাল দক্ষিণ গোলার্ধে তখন গ্রীষ্মকাল।তেমনি উত্তর গোলার্ধে যখন বসন্তকাল দক্ষিণ গোলার্ধে তখন শরৎকাল।আবার উত্তর গোলার্ধে যখন শরৎকাল দক্ষিণ গোলার্ধে তখন বসন্তকাল।বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান উত্তর গোলার্ধে।এখানে জুন মাসের দিকে গরম বেশি অনুভূত হয়।এই সময়ে দক্ষিণ গোলার্ধে শীতকাল।

ঋতু পরিবর্তনের কারণ :

(১) পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে দিবারাত্রির তারতম্যের জন্য উত্তাপের হ্রাস-বৃদ্ধি : পৃথিবীর ঘূর্ণনের কারণে সূর্য পৃথিবীর যে গোলার্ধের নিকট অবস্থান করে তখন সেই গোলার্ধে দিন বড় এবং রাত ছোট।পৃথিবী দিনের বেলায় তাপ গ্রহণ করে ফলে ভূপৃষ্ঠ উত্তপ্ত হয় এবং রাতের বেলায় বিকিরণ করে শীতল হয়।তখন একটি স্থানে বড় দিনে যে তাপ গ্রহণ করে ছোট রাতে সে তাপ পুরোটা বিকিরণ করতে পারে না।ঐ স্থানে সঞ্চিত তাপের কারণে আবহাওয়া উষ্ণ হয় এবং তাতে গ্রীষ্মকালীন আবহাওয়া পরিলক্ষিত হয়।বিপরীত গোলার্ধে রাত বড় এবং দিন ছোট হওয়াতে দিনের বেলায় যে তাপ গ্রহণ করে রাতের বেলায় সব তাপ বিকিরণ করে ঠান্ডা অনুভূত হয় তখন শীতকাল।

(২) পৃথিবীর গোলাকার আকৃতি : পৃথিবী গোল, তাই পৃথিবীর কোথাও সূর্যরশ্মি লম্বভাবে পড়ে আবার কোথাও তির্যকভাবে পড়ে।ফলে তাপমাত্রার পার্থক্য হয় এবং ঋতু পরিবর্তিত হয়।

(৩) পৃথিবীর উপবৃত্তাকার কক্ষপথ : পৃথিবীর আবর্তন পথ উপবৃত্তাকার তাই বছরের বিভিন্ন সময় সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব কম-বেশি হয়।এতে তাপমাত্রার পার্থক্য হয়, তাই ঋতু পরিবর্তিত হয়।

(৫) বার্ষিক গতির কারণে : পৃথিবীর বার্ষিক গতির জন্য সূর্যকিরণ বিভিন্ন স্থানে কম-বেশি পড়ার কারণে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রার পার্থক্য ঘটছে।ফলে বিভিন্ন স্থানে জলবায়ুর বিভিন্নতা হয়।একে ঋতু পরিবর্তন বলে।

ঋতু পরিবর্তন পদ্ধতি : পৃথিবীতে চারটি ঋতু- গ্রীষ্মকাল, শরৎকাল, শীতকাল ও বসন্তকাল।

উত্তর গোলার্ধে গ্রীষ্মকাল ও দক্ষিণ গোলার্ধে শীতকাল : ২১শে মার্চের পর থেকে পৃথিবী তার নিজ কক্ষপথে এগিয়ে চলার সঙ্গে সঙ্গে উত্তর মেরু ক্রমশ সূর্যের দিকে হেলতে থাকে। এর সঙ্গে সঙ্গে যত দিন যায় তত উত্তর মেরুতে আলোকিত অংশ বাড়তে থাকে।

উত্তর গোলার্ধে শরৎকাল ও দক্ষিণ গোলার্ধে বসন্তকাল : ২১শে জুন থেকে দক্ষিণ মেরু সূর্যের দিকে হেলতে থাকে।উত্তর গোলার্ধের অংশগুলো কম কিরণ পেতে থাকে এবং দক্ষিণ গোলার্ধের অংশগুলো বেশি সূর্যকিরণ পেতে থাকে।এভাবে ২৩শে সেপ্টেম্বর সূর্য নিরক্ষরেখার উপর লম্বভাবে কিরণ দেয়।তাই এ সময় পৃথিবীর সর্বত্র দিন ও রাত্রি সমান হয়। ২৩শে সেপ্টেম্বরের দেড় মাস আগে থেকেই উত্তর গোলার্ধে শরৎকালের সূচনা হয় এবং দেড় মাস পর পর্যন্ত এই শরৎকাল স্থায়ী থাকে।

দক্ষিণ গোলার্ধে গ্রীষ্মকাল : ২৩শে সেপ্টেম্বরের পর দক্ষিণ গোলার্ধ ক্রমশ সূর্যের দিকে হেলতে থাকে।এই সময় দক্ষিণ গোলার্ধ সূর্যের কাছে আসতে থাকে।উত্তর গোলার্ধ দূরে সরতে থাকে।ফলে দক্ষিণ গোলার্ধে সূর্য লম্বভাবে এবং উত্তর গোলার্ধে কোণ করে কিরণ দিতে থাকে।এতে উত্তর গোলার্ধে দিন ছোট ও দক্ষিণ গোলার্ধে দিন বড় এবং রাত ছোট হতে থাকে।এর মধ্যে ২২শে ডিসেম্বর সূর্য মকরক্রান্তির উপর লম্বভাবে কিরণ দেয়।সেই দিন উত্তর গোলার্ধে ছোট দিন ও বড় রাত হওয়াতে শীতকাল।

উত্তর গোলার্ধে বসন্তকাল ও দক্ষিণ গোলার্ধে শরৎকাল : পৃথিবী তার কক্ষপথে চলতে চলতে ২২শে ডিসেম্বরের পর থেকে ২১শে মার্চ পর্যন্ত এমন স্থানে ফিরে আসে যখন সূর্য নিরক্ষরেখার উপর লম্বভাবে কিরণ দিতে থাকে।ফলে ২১শে মার্চ পৃথিবীর সর্বত্র দিনরাত্রি সমান হয়। ২১শে মার্চ পৃথিবীর সর্বত্র দিনরাত্রি সমান হয় এবং ঐ দিনটিকে বাসন্ত বিষুব বা মহাবিষুব বলে

ফেরেলের সূত্রের সাহায্যে : আমরা জানি সমুদ্রস্রোত এবং বায়ুপ্রবাহ উত্তর গোলার্ধে ডান দিকে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে বাম দিকে বেঁকে যায়।এই বেঁকে যাওয়াটা ফেরেলের সূত্র নামে পরিচিত।

ফুকোর পরীক্ষা : ১৮৫১ সালে ফরাসি বিজ্ঞানী ফুকো (Foucault) প্যারিসের একটি গির্জার উপর থেকে লম্বা ও সরু তারের মাথায় একটা দোলক ঝুলিয়ে দোলকের তলায় পিন আটকে দেন।দোলকটি এমনভাবে ঝুলতে থাকে যাতে দোলার সময় পিনটি নিচের মাটির উপর দাগ কাটতে থাকে (চিত্র ২.১৪)। এরপর দোলকটিকে নির্দিষ্ট গতিতে উত্তর-দক্ষিণে দুলতে দিয়ে পর্যবেক্ষণ করেন যে, মাটির উপর আলপিনের দাগগুলো ধীরে ধীরে পূর্ব দিকে সরে যাচ্ছে।এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, আহ্নিক গতির ফলে পৃথিবী সর্বদা পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে এগিয়ে যায়।

তৃতীয় অধ্যায়

মানচিত্র পঠন ও ব্যবহার

মানচিত্রের ইতিহাস: প্রায় ৩,০০০ বছর পূর্বে মিসরের লোকজন প্রথম মানচিত্র তৈরি করেন।

মানচিত্রের প্রকারভেদ: মানচিত্রগুলোকে সাধারণত দুই ভাগে ভাগ করা যায়।যথা-
১।স্কেল অনুসারে
২।মানচিত্রের কার্যের উপর ভিত্তি করে।

প্রমাণ সময় ও স্থানীয় সময় (Standard Time and Local Time):

আমাদের পৃথিবীকে ৩৬০০ দ্রাঘিমারেখা দিয়ে ভাগ করা হয়েছে।এই ৩৬০০ কে আবার মূল মধ্যরেখা থেকে দুই দিকে অর্থাৎ পূর্ব ও পশ্চিম দিকে ১৮০০ করে ভাগ করা হয়েছে।এই ৩৬০০ দ্রাঘিমা পুরোটাই আসলে কাল্পনিক।আমরা জানি পৃথিবী নিজ অক্ষের উপর পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে ঘুরছে।প্রতি ২৪ ঘণ্টায় একবার পুরোটি ঘুরে আসছে। হিসাব করলে দেখা যাবে ৩৬০০ ঘুরে আসতে সময় লাগছে ২৪ ঘণ্টা অর্থাৎ ২৪ X ৬০ = ১৪৪০ মিনিট।এই ১৪৪০ মিনিটকে ৩৬০০ দিয়ে ভাগ করলে (১৪৪০ ÷ ৩৬০) = ৪ মিনিট।অর্থাৎ প্রতি ডিগ্রি দ্রাঘিমার জন্য সময় লাগছে ৪ মিনিট।এই হিসাবটার জন্যই একটি স্থান বা দেশে স্থানীয় সময় এবং প্রমাণ সময় ঠিক করা হয়।

স্থানীয় সময় (Local Time): পৃথিবী পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে ঘুরছে।পৃথিবীর যে অংশটি পূর্ব দিকে সেই অংশটিতে আগে সূর্যোদয় বা সকাল হয়।পৃথিবীর আবর্তনের ফলে কোনো একটি স্থানে সূর্য যখন ঠিক মাথার উপর আসে অর্থাৎ সূর্য এবং সেই স্থানের কোণ যদি হয় তখন ঐ স্থানে মধ্যাহ্ন।ঐ স্থানের ঘড়িতে তখন দুপুর ১২টা ধরা হয়।এই মধ্যাহ্ন থেকেই দিনের অন্যান্য সময়গুলো ঠিক করা হয়।আকাশে সূর্যের অবস্থান থেকে যে সময় স্থির করা হয় তাকে স্থানীয় সময় বলে।ঐ স্থান থেকে যত দূরের স্থান হবে সে হিসেবে প্রতি ১০ ডিগ্রি দ্রাঘিমার জন্য সময় বাড়বে বা কমবে।স্থানটি যদি সেই স্থানের পশ্চিমের দিকের স্থান হয় তবে এর ১০ ব্যবধানের জন্য ৪ মিনিট কম হবে।স্থানটি পূর্ব দিকের হলে ১০ ব্যবধানের জন্য ৪ মিনিট বেশি হবে।

প্রমাণ সময়: মধ্যাহ্ন সূর্যের অবস্থানকে সেই স্থানের দুপুর ১২টা ধরে স্থানীয় সময় নির্ধারণ করলে সাধারণত একটি বড় দেশের মধ্যে সময়ের গণনার বিভ্রাট হয়।এই সময়ের বিভ্রাট থেকে বাঁচার জন্য প্রত্যেক দেশে একটি প্রমাণ সময় নির্ধারণ করা হয়।সাধারণত কোনো একটি দেশের মধ্যভাগের দ্রাঘিমারেখা অনুযায়ী যে সময় নির্ধারণ করা হয় সে সময়কে ঐ দেশের প্রমাণ সময় ধরা হয়।দেশের আয়তনের উপর ভিত্তি করে প্রমাণ সময় একাধিক হতে পারে।আমরা জানি যুক্তরাষ্ট্রে ৪টি এবং কানাডাতে ৫টি প্রমাণ সময় রয়েছে।

যুক্তরাজ্যের লন্ডন শহরের অদূরে অবস্থিত গ্রিনিচের (০০ দ্রাঘিমায়) স্থানীয় সময়কে সমগ্র পৃথিবীর প্রমাণ সময় হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।আমাদের বাংলাদেশ যুক্তরাজ্যের পূর্ব দিকে অবস্থিত তাই আমাদের দেশে প্রমাণ সময় গ্রিনিচের সময়ের অগ্রবর্তী অর্থাৎ আমাদের এখানে গ্রিনিচের মধ্যাহ্নের পূর্বেই মধ্যাহ্ন হয়ে থাকে।গ্রিনিচের দ্রাঘিমা অন্যদিকে আমাদের বাংলাদেশের ঠিক মাঝখান দিয়ে ৯০০ দ্রাঘিমারেখা অতিক্রম করেছে।আর আমরা জানি প্রতি ১০ ডিগ্রির জন্য সময়ের পার্থক্য হয় ৪ মিনিট।তাই ৯০ -এর জন্য সময়ের পার্থক্য হবে ৯০ X ৪ = ৩৬০ মিনিট বা ৬ ঘণ্টা।এজন্য দ্রাঘিমার স্থানীয় সময়কে বাংলাদেশের প্রমাণ সময় ধরে কাজ করা হয়।আমাদের এখানে যখন দুপুর ১২টা তখন যুক্তরাজ্যের লন্ডন শহরে সকাল ৬টা বাজে।

স্থানভেদে সময়ের পার্থক্য: প্রতি ডিগ্রি দ্রাঘিমার জন্য সময়ের পার্থক্য হচ্ছে ৪ মিনিট।আমরা জানি যে পৃথিবী পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে ঘুরছে।এজন্যই পূর্ব দিকের স্থানগুলোতে আগে দিন হচ্ছে এবং পশ্চিম দিকের স্থানগুলোতে পরে দিন হচ্ছে।এতে আমরা বুঝতে পারি আমাদের বাংলাদেশ থেকে যেসব দেশ পূর্ব দিকে অবস্থিত সেসব দেশে আগে সকাল হবে এবং আমাদের পশ্চিম দিকের দেশগুলোতে পরে সকাল হবে। প্রতি ডিগ্রি দূরত্বের জন্য সময়ের ব্যবধান হচ্ছে ৪ মিনিট।এই প্রতিটি ডিগ্রিকে ৬০ মিনিটে ভাগ করা হয় এবং প্রতি ১ মিনিট দূরত্বের জন্য ৪ সেকেন্ড সময়ের পার্থক্য হয়। এখানে একটি বিষয় লক্ষ করতে হবে দূরত্বের ব্যবধানের মিনিটকে অনেকে সময়ের মিনিট হিসেবে ধরে ভুল করে। আসলে দূরত্বের মিনিট হচ্ছে প্রতি ১ ডিগ্রিকে ৬০ মিনিটে ভাগ করা হয়।এই দূরত্বের ৬০ মিনিটের প্রতি মিনিটের জন্য সময়ের ৪ সেকেন্ড লাগে।এভাবে দূরত্বের ব্যবধানের ৬০ মিনিটের জন্য লাগে ৬০ X ৪ = ২৪০ সেকেন্ড অর্থাৎ ৪ মিনিট সময়।

মানচিত্রে জিপিএস ও জিআইএস : বর্তমানে মানচিত্র তৈরি, পঠন এবং ব্যবস্থাপনার সবচেয়ে আধুনিক ব্যবহার হচ্ছে জিপিএস এবং জিআইএস।জিপিএস- এর ইংরেজি হলো Global Positioning System (GPS)।কোনো একটি স্থানের গ্লোবালি অবস্থান জানতে চাইলে সবচেয়ে সহজ উপায় হচ্ছে জিপিএস-এর মাধ্যমে জানা।

জিপিএস দ্বারা যেসব কাজ করা যায় তা হলো : জিপিএস দ্বারা কোনো একটি নির্দিষ্ট স্থানের অক্ষাংশ, দ্রাঘিমাংশ, উচ্চতা ও দূরত্ব জানা যায়।এছাড়া ঐ স্থানের উত্তর দিক, তারিখ ও সময় জানা যায়।

জিআইএস (Geographic Information System)

ভৌগোলিক তথ্য সংরক্ষণ ও বিশ্লেষণ ব্যবস্থাকে সংক্ষেপে জিআইএস বলে।এটি কম্পিউটারের মাধ্যমে তথ্য সংরক্ষণ ও বিশ্লেষণ ব্যবস্থা যার মধ্য দিয়ে ভৌগোলিক তথ্যগুলোর সংরক্ষণ, বিশ্লেষণ ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে স্থানিক ও পারিসরিক সমস্যা চিহ্নিতকরণ, মানচিত্রায়ণ ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা তৈরিতে সহায়তা করে থাকে। ১৯৬৪ সালে কানাডায় সর্বপ্রথম এই কৌশলের ব্যবহার আরম্ভ হয়।

চতুর্থ অধ্যায়

পৃথিবীর বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ গঠন

- জন্মের সময় পৃথিবী ছিল এক উত্তপ্ত গ্যাসপিণ্ড।এই গ্যাসপিণ্ড ক্রমে ক্রমে শীতল হয়ে ঘনীভূত হয়।এ সময় এর উপর যে আস্তরণ পড়ে তা হলো ভূত্বক।ভূত্বক যেসব উপাদান দিয়ে তৈরি তার সাধারণ নাম শিলা।
- ভূগর্ভের রয়েছে তিনটি স্তর।পৃথিবীর এই বিভিন্ন স্তরকে মণ্ডল বলে। অশ্মমণ্ডল, গুরুমণ্ডল ও কেন্দ্রমণ্ডল। উপরের স্তরটিকে অশ্মমণ্ডল বলে।ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগ থেকে পৃথিবীর অভ্যন্তরে প্রায় ১০০ কিলোমিটার গভীর পর্যন্ত হালকা উপাদানে গঠিত হয়েছে অশ্মমণ্ডল।
- অশ্মমণ্ডলের নিচে আরও দুটি প্রধান স্তর রয়েছে।গুরুমণ্ডল ও কেন্দ্রমণ্ডল।

পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ গঠন উপাদান : শিলা ও খনিজ (Rocks and Minerals)

শিলা: ভূত্বক যেসব উপাদান দ্বারা গঠিত তাদের সাধারণ নাম শিলা। গঠনপ্রণালি অনুসারে শিলাকে তিনটি প্রধান শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয় : (১) আগ্নেয় শিলা, (২) পাললিক শিলা ও (৩) রূপান্তরিত শিলা।

ভূমিকম্প (Earthquake): পৃথিবীর কঠিন ভূত্বকের কোনো কোনো অংশ প্রাকৃতিক কোনো কারণে কখনো কখনো অল্প সময়ের জন্য হঠাৎ কেঁপে ওঠে।ভূত্বকের এরূপ আকস্মিক কম্পনকে ভূমিকম্প বলে। **(35 Preli)**

ভূমিকম্পের কারণ :

১।ভূপাত : হঠাৎ কোনো কারণে পাহাড় বা পর্বত থেকে যদি বিশাল কোনো শিলাখণ্ড ভূত্বকের উপর ধসে পড়ে, তখন ভূমিকম্প হয়।
১৯১১ সালে পামীর মালভূমিতে বিশাল ভূপাত হওয়ার ফলে তুরস্কে ভূমিকম্প হয়েছিল।
২।শিলাচ্যুতি বা শিলাতে ভাঁজের সৃষ্টি :
৩।তাপ বিকিরণ :
৪।ভূগর্ভস্থ বাষ্প :
৫।ভূগর্ভস্থ চাপের বৃদ্ধি বা হ্রাস :
৬।আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত :
৮।হিমবাহের প্রভাব :
৯।পার্বত্য অঞ্চলের বনভূমি ধ্বংস ও পাহাড় কাটা :

ভূমিকম্পের ফলাফল :

(১) ভূমিকম্পের ফলে ভূত্বকের মধ্যে অসংখ্য ভাঁজ, ফাটল, চ্যুতি ও স্রস্ত উপত্যকার সৃষ্টি হয়।
(২) ভূমিকম্পের ফলে অনেক সময় সমুদ্রতল উপরে উত্থিত হয়, পাহাড়-পর্বত বা দ্বীপের সৃষ্টি করে।
(৩) ভূমিকম্পের ফলে অনেক সময় নদীর গতি পরিবর্তিত হয় বা কখনো কখনো বন্ধ হয়ে যায়।কখনো কখনো নদী শুকিয়ে যায়।আবার সময় সময় উচ্চভূমি অবনমিত হয়ে জলাশয়ের সৃষ্টি হয়।১৯৫০ সালে আসামের ভূমিকম্পে দিবং নদীর গতি পরিবর্তিত হয়।
(৪) ভূমিকম্পের ফলে অনেক সময় পর্বতগাত্র থেকে হিমানীসম্প্রপাত হয় এবং পর্বতের উপর শিলাপাত হয়।
(৫) ভূমিকম্পের ফলে হঠাৎ করে সমুদ্র উপকূল সংলগ্ন এলাকা জলোচ্ছ্বাসে প্লাবিত হয়।

সুনামি (Tsunami)

সুনামি (Tsunami) একটি জাপানি শব্দ।জাপানি ভাষায় এর অর্থ হলো 'পোতাশ্রয়ের ঢেউ'।সুনামির পানির ঢেউ সমুদ্রের স্বাভাবিক ঢেউয়ের মতো নয়।এটা সাধারণ ঢেউয়ের চেয়ে অনেক বিশালাকৃতির। সুনামির পানির ঢেউগুলো একের পর এক উঁচু হয়ে আসতেই থাকে তাই একে ঢেউয়ের রেলগাড়ি বা 'ওয়েভ ট্রেন' বলে।সুনামি হলো পানির এক মারাত্মক ঢেউ যা সমুদ্রের মধ্যে বা বিশাল হ্রদে ভূমিকম্প বা আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের কারণে সৃষ্টি হয়ে থাকে। ২০০৪ সালে ভারত মহাসাগরে যে সুনামি সৃষ্টি হয় তা এই মহাসাগরের আশেপাশে ১৪টি দেশে আঘাত হানে এবং মারাত্মক একটি দুর্যোগ সৃষ্টি করে।

নদী দ্বারা সৃষ্ট ভূমিরূপ :

নদী দুইভাবে ভূমিরূপের সৃষ্টি করে।একটি হলো এর ক্ষয়কার্য ও অপরটি হলো এর সঞ্চয়কার্য।নিম্নে নদীর ক্ষয়জাত ও সঞ্চয়জাত ভূমিরূপ বর্ণনা করা হলো।

নদীর ক্ষয়জাত ভূমিরূপ :

১।'ভি' আকৃতির উপত্যকা (V Shaped Valley) : ঊর্ধ্বগতি অবস্থায় নদীর স্রোতের বেগ প্রবল হওয়ার কারণে নদী বড় বড় শিলাখণ্ডকে বহন করে নিচের দিকে অগ্রসর হয়।পর্বতগুলো কঠিন শিলা দ্বারা গঠিত হলেও মাঝে মাঝে নরম শিলাও থাকে।নদীখাতে পার্শ্ব অপেক্ষা নিম্নদিকের শিলা বেশি কোমল বলে পার্শ্বক্ষয় অপেক্ষা নিম্নক্ষয় বেশি হয়। এভাবে ক্রমশ ক্ষয়ের ফলে নদী উপত্যকা অনেকটা ইংরেজি 'V' আকৃতির হয়।তাই একে 'ভি' আকৃতির উপত্যকা বলে। **(35 Preli)**

২।'ইউ' আকৃতির উপত্যকা (U Shaped Valley) : উর্ধ্বগতি অবস্থা শেষ করে নদী যখন মধ্যগতিতে সমভূমিতে এসে পড়ে তখন নদী তার নিম্নক্ষয়ের চেয়ে পার্শ্বক্ষয় বেশি করে।ফলে নদী উপত্যকা ক্রমশ প্রশস্ত হতে থাকে এবং কোনো কোনো স্থানে ইংরেজি 'U' অক্ষরের মতো হয়।এ ধরনের নদী উপত্যকাকে 'ইউ' আকৃতির উপত্যকা বলে।

৩।গিরিখাত ও ক্যানিয়ন (Gorge and Canyon) : উর্ধ্বগতি অবস্থায় নদীর প্রবল স্রোত খাড়া পর্বতগাত্র বেয়ে নিচের দিকে প্রবাহিত হয়।এতে ভূপৃষ্ঠ ক্ষয় হয় এবং ভূত্বক থেকে শিলাখণ্ড ভেঙে পড়ে।শিলাগুলো পরস্পরের সঙ্গে এবং নদীখাতের সঙ্গে সংঘর্ষে মসৃণ হয়ে অনেক দূর চলে যায়।এসব পাথরের সংঘর্ষে নদীর খাত গভীর ও সংকীর্ণ হতে থাকে।নদীর দুপাশের ভূমি ক্ষয় কম হলে বা না হলে এসব খাত খুব গভীর ও সংকীর্ণ হতে থাকে।এক পর্যায়ে এসব খাত খুব গভীর হয়।তখন এরূপ খাতকে গিরিসংকট বা গিরিখাত বলে।সিন্ধু নদের গিরিখাতটি প্রায় ৫১৮ মিটার গভীর।এটি পৃথিবীর একটি অন্যতম বৃহৎ গিরিখাত।

৪।জলপ্রপাত (Waterfall) : উর্ধ্বগতি অবস্থায় নদীর পানি যদি পর্যায়ক্রমে কঠিন শিলা ও নরম শিলার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয় তাহলে কোমল শিলাস্তরটিকে বেশি পরিমাণে ক্ষয় করে ফেলে।এর ফলে নরম শিলাস্তরের তুলনায় কঠিন শিলাস্তর অনেক উপরে অবস্থান করে এবং পানি খাড়াভাবে নিচের দিকে পড়তে থাকে।এরূপ পানির পতনকে জলপ্রপাত বলে ।উত্তর আমেরিকার সেন্ট লরেন্স নদীর বিখ্যাত নায়াগ্রা জলপ্রপাত এরূপে গঠিত হয়েছে।

ব-দ্বীপ সমভূমি:

নদী যখন মোহনার কাছাকাছি আসে তখন তার স্রোতের বেগ একেবারেই কমে যায়।এতে বালি ও কাদা তলানিরূপে সঞ্চিত হয়।নদীর স্রোতটান যদি কোনো সাগরে এসে পতিত হয় তাহলে ঐ সমস্ত বালি, কাদা নদীর মুখে জমে নদীমুখ প্রায় বন্ধ হয়ে যায় এবং ধীরে ধীরে এর স্তর সাগরের পানির উচ্চতার উপরে উঠে যায়।তখন নদী বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হয়ে এই চরাভূমিকে বেষ্টন করে সাগরে পতিত হয়।ত্রিকোণাকার এই নতুন সমতলভূমিকে ব-দ্বীপ সমভূমি বলে।এটি দেখতে মাত্রাহীন বাংলা 'ব' এর মতো এবং গ্রিক শব্দ 'ডেল্টা'র মতো তাই এর বাংলা নাম ব-দ্বীপ এবং ইংরেজি নাম 'Delta' হয়েছে।হুগলি নদী থেকে পূর্ব দিকে মেঘনার সীমানা পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশে সমস্ত দক্ষিণাংশ গঙ্গা ও পদ্মা নদীর বিখ্যাত ব-দ্বীপ অঞ্চল ।

পর্বত (Mountain): সমুদ্রতল থেকে অন্তত ১০০০ মিটারের বেশি উঁচু সুবিস্তৃত ও খাড়া ঢালবিশিষ্ট শিলাস্তূপকে পর্বত বলে।
পাহাড় (Hill): সাধারণত ৬০০ থেকে ১০০০ মিটার উঁচু স্বল্প বিস্তৃত শিলাস্তূপকে পাহাড় বলে।
মালভূমি (Plateau): পর্বত থেকে নিচু কিন্তু সমভূমি থেকে উঁচু খাড়া ঢালযুক্ত ঢেউ খেলানো বিস্তীর্ণ সমতলভূমিকে মালভূমি বলে
সমভূমি (Plains): সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে অল্প উঁচু মৃদু ঢালবিশিষ্ট সুবিসতৃৃত ভূমিকে সমভূমি বলে

পর্বতের প্রকারভেদ: উৎপত্তিগত বৈশিষ্ট্য ও গঠনপ্রকৃতির ভিত্তিতে পর্বত প্রধানত চার প্রকার।যথা-

(ক) ভঙ্গিল পর্বত (Fold Mountain)
(খ) আগ্নেয় পর্বত (Volcanic Mountain)
(গ) শিলাস্তূপ পর্বত (Block Mountain)
(ঘ) ল্যাকোলিথ পর্বত (Lacolith Mountain)

পঞ্চম অধ্যায়

বায়ুমণ্ডল

বায়ুমণ্ডল :

যে গ্যাসীয় আবরণ পৃথিবীকে বেষ্টন করে আছে তাকে বলে বায়ুমণ্ডল।পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির ফলে বায়ুমণ্ডলও ভূপৃষ্ঠের চারদিকে জড়িয়ে থেকে অনবরত আবর্তন করছে। বায়ুমণ্ডলের বর্ণ, গন্ধ, আকার কিছুই নেই।তাই একে খালি চোখে দেখা যায় না, কেবল অনুভব করা যায়। বিভিন্ন উপগ্রহ ও গবেষণার মাধ্যমে জানা গেছে, ভূপৃষ্ঠ থেকে উপরের দিকে প্রায় ১০,০০০ কিলোমিটার পর্যন্ত বায়ুমণ্ডল বিস্তৃত।

বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন উপাদানের তালিকা :

বায়ুমণ্ডল প্রধানত তিন প্রকার উপাদান দ্বারা গঠিত। যেমন- বিভিন্ন প্রকার গ্যাস, জলীয়বাষ্প এবং ধূলিকণা ও কণিকা।

উপাদানের নাম	শতকরা হার
নাইট্রোজেন (N_2)	৭৮.০২ **(35 Preli)**
অক্সিজেন (O_2)	২০.৭১
আরগন (Ar)	০.৮০
কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2)	০.০৩
অন্য গ্যাসসমূহ (নিয়ন, হিলিয়াম, ক্রিপটন, জেনন, ওজোন, মিথেন ও নাইট্রাস অক্সাইড)	০.০২
জলীয়বাষ্প	০.৪১
ধূলিকণা ও কণিকা	০.০১

বায়ুমণ্ডল নানাপ্রকার গ্যাস ও বাষ্পের সমন্বয়ে গঠিত হলেও এর প্রধান উপাদান দুটি- নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন।বায়ুমণ্ডলে আয়তনের দিক থেকে এ দুটি গ্যাস একত্রে শতকরা ৯৮.৭৩ ভাগ এবং বাকি শতকরা ১.২৭ ভাগ অন্যান্য গ্যাস, জলীয়বাষ্প ও কণিকাসমূহ জায়গা জুড়ে আছে।

বায়ুমণ্ডলের স্তরবিন্যাস ও বৈশিষ্ট্য:

- বায়ুমণ্ডল যে সমস্ত উপাদানে গঠিত তাদের প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য ও উষ্ণতার পার্থক্য অনুসারে ভূপৃষ্ঠ থেকে উপরের দিকে পর্যায়ক্রমে ছয়টি স্তরে ভাগ করা হয়। যথা- ট্রপোমণ্ডল, স্ট্রাটোমণ্ডল, মেসোমণ্ডল, তাপমণ্ডল, এক্সোমণ্ডল ও চৌম্বকমণ্ডল।
- উলি-খিত স্তরগুলোর প্রথম তিনটি সমমণ্ডল (Homosphere) এবং পরবর্তী তিনটি বিষমমণ্ডল (Hetrosphere)-এর অন্তর্ভুক্ত।

ট্রপোমণ্ডল (Troposphere): এই স্তরটি বায়ুমণ্ডলের সবচেয়ে নিচের স্তর।মেঘ, বৃষ্টিপাত, বজ্রপাত, বায়ুপ্রবাহ, ঝড়, তুষারপাত, শিশির, কুয়াশা সবকিছুই এই স্তরে সৃষ্টি হয়। ট্রপোমণ্ডলের শেষ প্রান্তের অংশের নাম ট্রপোবিরতি (Tropopause)। এই স্তর ভূপৃষ্ঠ থেকে নিরক্ষীয় অঞ্চলে প্রায় ১৬-১৮ কিলোমিটার এবং মেরু অঞ্চলে প্রায় ৮-৯ কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত।ভূপৃষ্ঠ থেকে উচ্চতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বায়ুর ঘনত্ব কমতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে কমতে থাকে উষ্ণতা।সাধারণভাবে প্রতি ১,০০০ মিটার উচ্চতায় ৬০ সেলসিয়াস তাপমাত্রা হ্রাস পায় নিচের দিকের বাতাসে জলীয়বাষ্প বেশি থাকে। আবহাওয়া ও জলবায়ুজনিত যাবতীয় প্রক্রিয়ার বেশিরভাগ এই স্তরে ঘটে থাকে।

স্ট্রাটোমণ্ডল (Stratosphere): ট্রপোপজের উপরের দিকে প্রায় ৫০ কিলোমিটার পর্যন্ত স্ট্রাটোমণ্ডল নামে পরিচিত।স্ট্রাটোমণ্ডল ও মেসোমণ্ডলের মধ্যবর্তী অঞ্চলে তাপমাত্রার স্থিতাবস্থাকে স্ট্রাটোবিরতি (Stratopause) বলে।এই স্তরের বায়ুতে অতি সূক্ষ্ম ধূলিকণা ছাড়া কোনোরকম জলীয়বাষ্প থাকে না।ফলে আবহাওয়া থাকে শান্ত ও শুষ্ক।ঝড়-বৃষ্টি থাকে না বলেই এই স্তরের মধ্য দিয়ে সাধারণত জেট বিমানগুলো চলাচল করে। এই স্তরেই ওজোন (O3) গ্যাসের স্তর বেশি পরিমাণে আছে।এ ওজোন স্তর সূর্যের আলোর বেশিরভাগ অতিবেগুনি রশ্মি (Ultraviolet Rays) শুষে নেয়।

মেসোমণ্ডল (Mesosphere): স্ট্রাটোবিরতির উপরে প্রায় ৮০ কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত বায়ুস্তরকে মেসোমণ্ডল বলে।এই স্তরের উপরে তাপমাত্রা হ্রাস পাওয়া থেমে যায়।এই স্তরে ট্রপোমণ্ডলের মতোই উচ্চতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা কমতে থাকে।মহাকাশ থেকে যেসব উল্কা পৃথিবীর দিকে ছুটে আসে সেগুলোর অধিকাংশই এই স্তরের মধ্যে এসে পুড়ে যায়।

তাপমণ্ডল (Thermosphere): মেসোপজের উপরে প্রায় ৫০০ কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত বায়ুস্তরকে তাপমণ্ডল বলে।এই মণ্ডলে বায়ুস্তর অত্যন্ত হালকা ও চাপ ক্ষীণ। তাপমণ্ডলের নিম্ন অংশকে আয়নমণ্ডল (Ionosphere) বলে।এই অংশে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা অত্যন্ত দ্রুত হারে বাড়তে থাকে। তীব্র সৌর বিকিরণে রঞ্জন রশ্মি ও অতিবেগুনি রশ্মির সংঘাতে এই অংশের বায়ু আয়নযুক্ত হয়। ভূপৃষ্ঠ থেকে পাঠানো বিভিন্ন বেতারতরঙ্গ আয়নমণ্ডলের বিভিন্ন আয়নে বাধা পেয়ে পুনরায় ভূপৃষ্ঠে ফিরে আসে।

এক্সোমণ্ডল (Exhosphere): তাপমণ্ডলের উপরে প্রায় ৭৫০ কিলোমিটার পর্যন্ত যে বায়ুস্তর আছে তাকে এক্সোমণ্ডল বলে।এই স্তরে হিলিয়াম ও হাইড্রোজেন গ্যাসের প্রাধান্য দেখা যায়।

চৌম্বকমণ্ডল (Magnotosphere): এক্সোমণ্ডলের উপরে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল বেষ্টনকারী একটি চৌম্বকক্ষেত্র, যার নাম চৌম্বকমণ্ডল।এই স্তরে বায়ুমণ্ডলকে বেষ্টন করে প্রোটন ও ইলেকট্রনের চৌম্বকীয় ক্ষেত্রের সৃষ্টি হয়।

বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন স্তরের গুরুত্ব :

- বায়ুমণ্ডল ছাড়া যেমন কোনো শব্দতরঙ্গ স্থানান্তরিত হয় না, তেমনি ভূপৃষ্ঠ থেকে পাঠানো বেতারতরঙ্গ আয়নস্তরে বাধা পেয়ে পৃথিবীতে ফিরে আসে।
- ট্রপোমণ্ডল ছাড়া কোনো আবহাওয়ারও সৃষ্টি হতো না; বরফ জমত না; মেঘ, বৃষ্টি, কুয়াশা, শিশির, তুষার, শিলাবৃষ্টি ইত্যাদির সৃষ্টি হতো না।শস্য ও বনভূমির জন্য প্রয়োজনীয় বৃষ্টি হতো না।
- পৃথিবীতে বায়ুমণ্ডলীয় স্তর থাকায় এর দিকে আগত উল্কাপিণ্ড অধিক পরিমাণে বিধ্বস্ত হয়।ওজোন স্তর না থাকলে সূর্য থেকে মারাত্মক অতিবেগুনি রশ্মি বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে প্রাণিকুল বিনষ্ট করত।

পানিচক্র (Water Cycle) :

পানি বাষ্পীয়, তরল ও কঠিন এ তিন অবস্থায় থাকতে পারে।সমগ্র বিশ্বের পানি সরবরাহের সর্ববৃহৎ ও স্থায়ী আধার হচ্ছে সমুদ্র।বাষ্পীভবনের মাধ্যমে সমুদ্রের পানি উত্তপ্ত ও হালকা হয়ে বাষ্পাকারে উপরে ওঠে এবং সুবিশাল বায়ুমণ্ডলে মিশে যায়।এছাড়া ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদ থেকে প্রস্বেদনের মাধ্যমে জলীয় অংশ বায়ুমণ্ডলে সম্পৃক্ত হয়। জলীয়বাষ্পপূর্ণ বায়ু শীতল ও ঘনীভূত হয়ে মেঘ, বৃষ্টি, শিশির, কুয়াশা, তুষার, বরফ প্রভৃতিতে পরিণত হয় এবং যেগুলো বৃষ্টিপাতসহ বিভিন্ন রূপে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির টানে ভূপৃষ্ঠে পতিত হয়।বিভিন্ন উপায়ে ভূপৃষ্ঠে পতিত পানির কিছুঅংশ বাষ্পীভবনের মাধ্যমে পুনরায় বায়ুমণ্ডলে মিশে যায়, কিছুঅংশ নদী দ্বারা বাহিত হয়ে (Run-off) সমুদ্রে পতিত হয়, কিছুঅংশ উদ্ভিদ অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় (Osmosis) গ্রহণ করে এবং অবশিষ্টাংশ ভূপৃষ্ঠের শিলাস্তরের মধ্যে চুয়ে (Percolation) প্রবেশ করে।এভাবেই প্রকৃতিতে পানিচক্র চলতে থাকে

পানিচক্রের প্রক্রিয়াগুলোর বর্ণনা নিম্নে দেওয়া হলো :

বাষ্পীভবন (Evaporation) : সূর্যের তাপে সমুদ্র, নদী, হ্রদ প্রভৃতি থেকে পানি ক্রমাগত বাষ্পে পরিণত হচ্ছে এবং তা অপেক্ষাকৃত হালকা বলে উপরে উঠে বায়ুমণ্ডলে মিশে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে।একে বাষ্পীভবন বলে।

ঘনীভবন (Condensation) : পরিপৃক্ত বায়ু উষ্ণতর হলে তখন এটি আরও বেশি জলীয়বাষ্প ধারণ করতে পারে।আবার বায়ু শীতল হতে থাকলে পূর্বের মতো বেশি জলীয়বাষ্প ধারণ করে রাখতে পারে না, তখন জলীয়বাষ্পের কিছুঅংশ পানিতে পরিণত হয়, তাকে ঘনীভবন বলে।

বায়ু নির্দিষ্ট পরিমাণ জলীয়বাষ্প ধারণ করতে পারে।কিন্তু বায়ুর উষ্ণতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার জলীয়বাষ্প ধারণ করার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।কোনো নির্দিষ্ট উষ্ণতায় বায়ু যে পরিমাণ জলীয়বাষ্প ধারণ করতে পারে, সেই পরিমাণ জলীয়বাষ্প বায়ুতে থাকলে বায়ু আর অধিক জলীয়বাষ্প গ্রহণ করতে পারে না।

বায়ুর আর্দ্রতা (Atmospheric Humidity) :
জলীয়বাষ্প বায়ুর একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।বায়ুর জলীয়বাষ্প ধারণ করাকে বায়ুর আর্দ্রতা বলে।বায়ুমণ্ডলে জলীয়বাষ্পের পরিমাণ শতকরা ১ ভাগেরও কম।বায়ুতে জলীয়বাষ্প যখন একদম থাকে না, তাকে শুষ্ক বায়ু বলে।যে বায়ুতে জলীয়বাষ্প বেশি থাকে, তাকে আর্দ্র বায়ু বলে।আর্দ্র বায়ুতে জলীয়বাষ্পের পরিমাণ থাকে প্রায় শতকরা ২ থেকে ৫ ভাগ।বায়ুর আর্দ্রতা হাইগ্রোমিটার (Hygrometer) দ্বারা পরিমাপ করা হয়।বায়ুর আর্দ্রতা দুভাবে প্রকাশ করা যায়।যথা- পরম আর্দ্রতা (Absolute Humidity) ও আপেক্ষিক আর্দ্রতা (Relative Humidity)।

পরম আর্দ্রতা: কোনো নির্দিষ্ট আয়তনের বায়ুতে জলীয়বাষ্পের প্রকৃত পরিমাণকে পরম আর্দ্রতা বলে।

আপেক্ষিক আর্দ্রতা: কোনো নির্দিষ্ট আয়তনের বায়ুতে জলীয়বাষ্পের প্রকৃত পরিমাণ আর একই আয়তনের বায়ুকে একই উষ্ণতায় পরিপৃক্ত করতে যে পরিমাণ জলীয়বাষ্পের প্রয়োজন এ দুটির অনুপাতকে আপেক্ষিক আর্দ্রতা বলে।

বিশ্ব উষ্ণায়ন ও জলবায়ুর পরিবর্তন: বিশ্ব উষ্ণায়ন হার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধির ফলে পৃথিবীর জলবায়ু পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে।পৃথিবীর সৃষ্টি থেকে জলবায়ু কখনো এক থাকেনি। কখনো খুব উষ্ণ ও শুষ্ক থেকেছে।কখনো শীতল হয়ে বরফে ঢেকেছে। একশত বছর পূর্বের গড় তাপমাত্রার তুলনায় প্রায় ০.৬০০ সেলসিয়াস তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে।বিজ্ঞানীগণ কম্পিউটার প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে জলবায়ুগত পরিবর্তন সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, ২১ শতকের সমাপ্তিকালের মধ্যে গড় তাপমাত্রা প্রায় আরও অতিরিক্ত ২.৫০ থেকে ৫.৫০ সেলসিয়াস তাপমাত্রা যুক্ত হতে পারে।

বিশ্ব উষ্ণায়নের জন্য দায়ী গ্যাসগুলো হলো কার্বন ডাই-অক্সাইড, নাইট্রাস অক্সাইড, মিথেন, ক্লোরোফ্লোরো কার্বন।শিল্পায়ন, যানবাহনের সংখ্যাগত বৃদ্ধি, বনাঞ্চল উজাড়, পারমাণবিক পরীক্ষা ও কৃষির সম্প্রসারণ ইত্যাদি কর্মকাণ্ডের কারণে উলি-খিত গ্যাসের পরিমাণ বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে।বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে বাংলাদেশে অধিক বৃষ্টিপাত, ব্যাপক বন্যা, ভয়ঙ্কার ঘূর্ণিঝড়, খরা প্রভৃতি জলবায়ুগত পরিবর্তন সাধিত হতে পারে।পরিবেশ সংরক্ষণ ও টেকসই উন্নয়ন কৌশল পৃথিবী ও তার পরিবেশকে এবং সেইসঙ্গে বাংলাদেশের মতো দেশসমূহকে এর বিশ্ব উষ্ণায়নের বিপর্যয় থেকে রক্ষা করতে পারে।

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব :
বৃষ্টির সময়ে অনাবৃষ্টি, খরার সময়ে বৃষ্টি, গরমের সময়ে উত্তরে হাওয়া, শীতের সময়ে তপ্ত হাওয়া কেমন যেন এলোমেলো আবহাওয়া লক্ষ করা যায়।বিজ্ঞানীদের হিসাব অনুযায়ী গ্রিনহাউস প্রভাব পৃথিবীর কয়েকটি দেশে যথা- কানাডা, রাশিয়া, নরওয়ে, ফিনল্যান্ড, সুইডেন, দক্ষিণ আমেরিকা প্রভৃতি দেশগুলোর জন্য সাফল্য বয়ে আনবে।এ কারণে ঐসব অঞ্চলের লাখ লাখ একর জমি বরফমুক্ত হয়ে চাষাবাদ ও বসবাসযোগ্য হয়ে উঠবে।অন্যদিকে দুর্ভোগ বাড়বে পৃথিবীর প্রায় ৪০ শতাংশ এলাকার দরিদ্র অধিবাসীদের।কারণ গ্রিনহাউস প্রতিক্রিয়ার ফলে বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে উপকূলীয় এলাকার এক বিরাট অংশ পানির নিচে তলিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

পৃথিবী উষ্ণায়নের ফলে একবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় বিশ্বের মোট জনসমষ্টির প্রায় ২০ শতাংশ অধিবাসীর সরাসরি ভাগ্য বিপর্যয় দেখা দিতে পারে।এশীয় ও প্রশান্তমহাসাগরীয় অঞ্চলে সমুদ্রপৃষ্ঠ ফুলে উঠলে আবহাওয়ার প্রকৃতিই বদলে যাবে। বিশ্বব্যাপী সমানভাবে উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্থবিরতায় এক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে।উন্নত বিশ্ব তাদের উৎপাদিত শস্যের বাড়তি অংশ পশুখাদ্য হিসেবে ব্যবহার করবে, আর উন্নয়নশীল গরিব দেশগুলোর মানুষ না খেয়ে কঙ্কালসার জীবনযাপনের মাধ্যমে নিজ দেশের সীমানা পেরিয়ে পরিবেশ শরণার্থী হয়ে উঠবে। ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া, চীন, মালয়েশিয়া প্রভৃতি দেশের জলবায়ুর ধরন সাম্প্রতিক সময়ে সম্পূর্ণভাবে বদলে যাচ্ছে।অস্ট্রেলিয়ার গ্রীষ্মকাল দীর্ঘতর হয়ে উঠেছে, শীতকালও পূর্বের তুলনায় বর্ষাসিক্ত হয়ে উঠেছে।

বাংলাদেশ প্রেক্ষিত মানুষের নিয়ন্ত্রণহীন ব্যবহারের কারণে মাত্রাতিরিক্ত গ্রিনহাউস গ্যাস অর্থাৎ কার্বন ডাই-অক্সাইড, মিথেন, নাইট্রাস অক্সাইড এবং ক্লোরোফ্লোরো কার্বন (CFC) গ্যাসগুলো নির্গমনের কারণে বিশ্বে উষ্ণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।জাতিসংঘ তার সতর্কীকরণে বলেছে পরবর্তী ৫০ বছরে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ৩ ফুট বাড়লে তাতে বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলবর্তী একটি অংশ প-াবিত হবে এবং প্রায় ১৭ শতাংশ ভূমি পানির নিচে চলে যাবে।আনুমানিক ৩ কোটি মানুষ তাদের ঘরবাড়ি, ফসলি জমি হারিয়ে জলবায়ু উদ্বাস্তুতে পরিণত হবে।ইন্টারন্যাশনাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ-এর তথ্য অনুসারে ২০৩০ সালের পর নদীর প্রবাহ নাটকীয়ভাবে কমে যাবে।ফলে এশিয়ায় পানির স্বল্পতা দেখা দেবে এবং ২০৫০ সালের মধ্যে প্রায় ১০০ কোটি মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হবে।উচ্চ তাপমাত্রার প্রভাবে ঘন ঘন বন্যা, ঝড়, অনাবৃষ্টি এবং সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাবে।যা ইতোমধ্যেই বাংলাদেশে অনুভূত হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে আরও বাড়বে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বারিমন্ডল

বারিমন্ডলের ধারণা

- 'Hydrosphere'-এর বাংলা প্রতিশব্দ বারিমন্ডল।'Hydro' শব্দের অর্থ পানি এবং 'Sphere' শব্দের অর্থ ক্ষেত্র।
- জলরাশি পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় থাকে যেমন-কঠিন (বরফ), গ্যাসীয় (জলীয়বাষ্প) এবং তরল।
- পৃথিবীর সকল জলরাশির শতকরা 97 ভাগ পানি রয়েছে সমুদ্রে (মহাসাগর, সাগর ও উপসাগর)। মাত্র 3 ভাগ পানি রয়েছে নদী, হিমবাহ, ভূগর্ভস্থ হ্রদ, মৃত্তিকা, বায়ুমন্ডল ও জীবমন্ডলে।
- পৃথিবীর সমস্ত পানিকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় যেমন-লবণাক্ত ও মিঠা পানি।পৃথিবীর সকল মহাসাগর, সাগর ও উপসাগরের জলরাশি লবণাক্ত এবং নদী, হ্রদ ও ভূগর্ভস্থ পানি মিঠা পানির উৎস্।

মহাসাগর (Ocean) : বারিমন্ডলের উন্মুক্ত বিস্তীর্ণ বিশাল লবণাক্ত জলরাশিকে মহাসাগর (Ocean) বলে।পৃথিবীতে পাঁচটি মহাসাগর রয়েছে, এগুলো হলো প্রশান্ত মহাসাগর, আটলান্টিক মহাসাগর, ভারত মহাসাগর, উত্তর মহাসাগর এবং দক্ষিণ মহাসাগর

- এর মধ্যে প্রশান্ত মহাসাগর বৃহত্তম ও গভীরতম। আটলান্টিক মহাসাগর ভগ্ন উপকূলবিশিষ্ট এবং এটি অনেক আবদ্ধ সাগরের (Enclosed Sea) সৃষ্টি করেছে।
- ভারত মহাসাগর এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশ দ্বারা পরিবেষ্টিত।
- ৬০° দক্ষিণ অক্ষাংশ থেকে এন্টার্কটিকার হিমভাগ পর্যন্ত দক্ষিণ মহাসাগরের অবস্থান।দক্ষিণ মহাসাগরের দক্ষিণে এন্টার্কটিকা মহাদেশ বছরের সকল সময় বরফে আচ্ছন্ন থাকে।
- উত্তর গোলার্ধের উত্তর প্রান্তে উত্তর মহাসাগর অবস্থিত এবং এর চারদিক স্থলবেষ্টিত।

মহাসাগর	আয়তন (বর্গকিলোমিটার)	গড় গভীরতা (মিটার)	অবস্থান
প্রশান্ত মহাসাগর	১৬ কোটি ৬০ লক্ষ	৪,২৭০	আমেরিকা ও এশিয়ার মধ্যবর্তী
আটলান্টিক মহাসাগর	৮ কোটি ২৪ লক্ষ	৩,৯৩২	আমেরিকা, ইউরোপ ও আফ্রিকা
ভারত মহাসাগর	৭ কোটি ৩৬ লক্ষ	৩,৯৬২	আফ্রিকা, ভারত ও অস্ট্রেলিয়া
উত্তর মহাসাগর	১ কোটি ৫০ লক্ষ	৮২৪	পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধ
দক্ষিণ মহাসাগর	১ কোটি ৪৭ লক্ষ	১৪৯	এন্টার্কটিকা ও 60° দক্ষিণ অক্ষাংশের মধ্যবর্তী

সাগর (Sea): মহাসাগর অপেক্ষা স্বল্প আয়তনবিশিষ্ট জলরাশিকে সাগর বলে।**যথা-**ভূমধ্যসাগর, লোহিত সাগর, ক্যারিবিয়ান সাগর, জাপান সাগর ইত্যাদি।
উপসাগর (Bay): তিনদিকে স্থলভাগ দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং একদিকে জল তাকে উপসাগর বলে।**যথা-**বঙ্গোপসাগর, পারস্য উপসাগর ও মেক্সিকো উপসাগর ইত্যাদি।
হ্রদ (Lake): চারদিকে স্থলভাগ দ্বারা বেষ্টিত জলভাগকে হ্রদ বলে।**যথা-**রাশিয়ার বৈকাল হ্রদ, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার সীমান্তে অবস্থিত সুপিরিয়র হ্রদ ও আফ্রিকার ভিক্টোরিয়া হ্রদ ইত্যাদি।

সমুদ্র তলদেশের ভূমিরূপ ও সামুদ্রিক সম্পদ :
সমুদ্রতলে আগ্নেয়গিরি, শৈলশিরা, উচ্চভূমি ও গভীর খাত প্রভৃতি বিদ্যমান আছে।শব্দতরঙ্গের সাহায্যে সমুদ্রের গভীরতা আবারও মাপা হয়।এ শব্দতরঙ্গ প্রতি সেকেন্ডে পানির মধ্য দিয়ে প্রায় ১,৪৭৫ মিটার নিচে যায় এবং আবার ফিরে আসে।ফ্যাদোমিটার (Fathometer) যন্ত্রটি দিয়ে সমুদ্রের গভীরতা মাপা হয়।

সমুদ্রের তলদেশের ভূমিরূপকে পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করা হয়:

(1) মহীসোপান (Continental shelf)
(2) মহীঢাল (Continental slope)
(3) গভীল সমুদ্রের সমভূমি (Deep sea plain)
(4) নিমজ্জিত শৈলশিরা (Oceanic ridge)
(5) গভীর সমুদ্রখাত (Oceanic trench)

(১) মহীসোপান : পৃথিবীর মহাদেশসমূহের চারদিকে স্থলভাগের কিছু অংশ অল্প ঢালু হয়ে সমুদ্রের পানির মধ্যে নেমে গেছে।এরূপে সমুদ্রের উপকূলরেখা থেকে তলদেশ ক্রমনিম্ন নিমজ্জিত অংশকে মহীসোপান বলে।মহীসোপানের সমুদ্রের পানির সর্বোচ্চ গভীরতা ২০০ মিটার।এটি ০.১ ডিগ্রি কোণে সমুদ্র তলদেশে নিমজ্জিত থাকে।মহীসোপানের গড় প্রশস্ততা 70 কিলোমিটার।মহীসোপানের সবচেয়ে উপরের অংশকে উপকূলীয় ঢাল বলে। ইউরোপের উত্তর-পশ্চিমে পৃথিবীর বৃহত্তম মহীসোপান অবস্থিত। স্থলভাগের উপকূলীয় অঞ্চল নিমজ্জিত হওয়ার ফলে অথবা সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতার তারতম্য হওয়ার কারণে মহীসোপানের সৃষ্টি হয়।

(২) মহীঢাল: মহীসোপানের শেষ সীমা থেকে ভূভাগ হঠাৎ খাড়াভাবে নেমে সমুদ্রের তলদেশের সঙ্গে মিশে যায়।এ অংশকে মহীঢাল বলে।সমুদ্রে এর গভীরতা ২০০ থেকে ৩,০০০ মিটার।

(৩) গভীর সমুদ্রের সমভূমি : মহীঢাল শেষ হওয়ার পর থেকে সমুদ্র তলদেশে যে বিস্তৃত সমভূমি দেখা যায় তাকে গভীর সমুদ্রের সমভূমি বলে।এর গড় গভীরতা ৫,০০০ মিটার।

(৪) নিমজ্জিত শৈলশিরা: সমুদ্রের অভ্যন্তরে অনেকগুলো আগ্নেয়গিরি অবস্থান করছে।ঐসব আগ্নেয়গিরি থেকে লাভা বেরিয়ে এসে সমুদ্রগর্ভে সঞ্চিত হয়ে শৈলশিরার ন্যায় ভূমিরূপ গঠন করেছে।এগুলোই নিমজ্জিত শৈলশিরা নামে পরিচিত।

(৫) গভীর সমুদ্রখাত: গভীর সমুদ্রের সমভূমি অঞ্চলের মাঝে মাঝে গভীর খাত দেখা যায়।এ সকল খাতকে গভীর সমুদ্রখাত বলে।
প্রশান্ত মহাসাগরেই গভীর সমুদ্রখাতের সংখ্যা অধিক।

সমুদ্রস্রোতের কারণ :

- নিয়ত বায়ুপ্রবাহ
- পৃথিবীর আহ্নিক গতি
- সমুদ্রজলের তাপমাত্রার পার্থক্য
- মেরু অঞ্চলের সমুদ্রের বরফের গলন
- সমুদ্রের গভীরতার তারতম্য
- সমুদ্রের লবণাক্ততার পার্থক্য
- ভূখন্ডের অবস্থান

জোয়ার-ভাটা : জোয়ার ও ভাটা (Tide): সমুদ্র এবং উপকূলবর্তী নদীর জলরাশি প্রতিদিনই কোনো একটি সময়ে ঐ জলরাশি ধীরে ধীরে ফুলে উঠছে এবং কিছুক্ষণ পরে আবার তা ধীরে ধীরে নেমে যাচ্ছে।জলরাশির এরকম নিয়মিত স্ফীতি বা ফুলে ওঠাকে জোয়ার বা নেমে যাওয়াকে ভাটা বলে।

জোয়ার-ভাটার কারণ: প্রধানত দুটি কারণে জোয়ার-ভাটার সৃষ্টি হয়।এগুলো হলো-(১) চাঁদ ও সূর্যের মহাকর্ষ শক্তির প্রভাব এবং (২) পৃথিবীর আবর্তনের ফলে উৎপন্ন কেন্দ্রাতিগ শক্তি।

জোয়ার-ভাটার প্রভাব:

- আবর্জনাসমূহ নদীর মধ্য দিয়ে সমুদ্রে গিয়ে পতিত হয় ।
- দৈনিক দুবার জোয়ার-ভাটা হওয়ার ফলে ভাটার টানে নদীর মোহনায় পলি ও আবর্জনা জমতে পারে না ।
- জোয়ার-ভাটার ফলে সৃষ্ট স্রোতের সাহায্যে নদীখাত গভীর হয়। **(35 Preli)**
- বহু নদীতে ভাটার স্রোতের বিপরীতে বাঁধ দিয়ে জলবিদ্যুৎ (Hydro-electric) উৎপাদন করা হয়।
- জোয়ারের পানি আটকিয়ে সেচকার্যে ব্যবহার করা হয় ।
- শীতপ্রধান দেশে সমুদ্রের লবণাক্ত পানি জোয়ারের সাহায্যে নদীতে প্রবেশ করে এবং এর ফলে নদীর পানি সহজে জমে না।জোয়ার-ভাটার ফলে নৌযান চলাচলের মাধ্যমে ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধা হয় ।
- অমাবস্যা ও পূর্ণিমা তিথিতে নদীতে জোয়ারের সময় বান ডাকার ফলে অনেক সময় নৌকা, লঞ্চ প্রভৃতি ডুবে যায় বা ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং এতে নদীর পার্শ্ববর্তী এলাকায় জানমালের ক্ষতি হয়।

দশম অধ্যায়

বাংলাদেশের ভৌগোলিক বিবরণ

বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার একটি স্বাধীন রাষ্ট্র।ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে কর্কটক্রান্তি রেখা এ দেশের মধ্যভাগ দিয়ে অতিক্রম করেছে।এখানকার বিভিন্ন ধরনের ভূপ্রকৃতি, অনেক নদ-নদী, বঙ্গোপসাগরের অবস্থান, ঋতুভিত্তিক পরিবর্তিত জলবায়ু নানান বৈচিত্র্যতা আনয়ন করেছে ।

বাংলাদেশের অবস্থান :

এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণাংশে দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের অবস্থান।বাংলাদেশ একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র।এ দেশ ২০০৩৪´ উত্তর অক্ষরেখা থেকে ২৬০৩৮´ উত্তর অক্ষরেখার মধ্যে এবং ৮৮০০১´ পূর্ব দ্রাঘিমারেখা থেকে ৯২০৪১´ পূর্ব দ্রাঘিমারেখার মধ্যে অবস্থিত।বাংলাদেশের মাঝামাঝি স্থান দিয়ে কর্কটক্রান্তি রেখা অতিক্রম করেছে।

আয়তন :

বাংলাদেশের আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গকিলোমিটার।বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ১৯৯৬-৯৭ সালের তথ্য অনুসারে দেখা যায়, বাংলাদেশের নদী অঞ্চলের আয়তন ৯,৪০৫ বর্গকিলোমিটার।বনাঞ্চলের আয়তন ২১,৬৫৭ বর্গকিলোমিটার। বাংলাদেশের দক্ষিণ অংশে উপকূল অঞ্চলে বিশাল এলাকা ক্রমান্বয়ে জেগে উঠেছে।ভবিষ্যতে দক্ষিণ অংশের প্রসার ঘটলে বাংলাদেশের আয়তন আরও বৃদ্ধি পাবে।বাংলাদেশের টেরিটোরিয়েল সমুদ্রসীমা ১২ নটিক্যাল মাইল, অর্থনৈতিক একান্ত অঞ্চল ২০০ নটিক্যাল মাইল এবং সামুদ্রিক মালিকানা মহীসোপানের শেষ সীমানা পর্যন্ত।মায়ানমার ও ভারতের দাবিকৃত সমদূরত্ব পদ্ধতিতে বাংলাদেশের সমুদ্রসীমা ১৩০ নটিক্যাল মাইলের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছিল।

বঙ্গোপসাগরের জলসীমা নির্ধারণ ও সমুদ্র সম্পদের উপর অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ১৪ই ডিসেম্বর, ২০০৯ সালে মায়ানমারের বিপক্ষে জার্মানির হামবুর্গে অবস্থিত সমুদ্র আইন বিষয়ক ট্রাইব্যুনালে এবং ভারতের বিপক্ষে নেদারল্যান্ডসের হেগে অবস্থিত সালিশ ট্রাইব্যুনালে মামলা দায়ের করে।বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে গত ১৪ই মার্চ, ২০১২ সালে বাংলাদেশ-মায়ানমার মামলায় আন্তর্জাতিক আদালত বাংলাদেশের ন্যায্যভিত্তিক দাবির পক্ষে ঐতিহাসিক রায় পায়।এ রায়ের ফলে বাংলাদেশ প্রায় এক লক্ষ বর্গকিলোমিটারেরও বেশি জলসীমা পেয়েছে।এ রায়ের মাধ্যমে সেন্টমার্টিন দ্বীপকে উপকূলীয় বেজলাইন ধরে ১২ নটিক্যাল মাইল রাষ্ট্রাধীন সমুদ্র এলাকা (Territorial sea area) এবং ২০০ নটিক্যাল মাইল একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চল বা একান্ত অর্থনৈতিক অঞ্চল ( ) পেয়েছে। উপকূল থেকে ৩৫০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত সাগরের তলদেশে বাংলাদেশের মহীসোপান রয়েছে (১ নটিক্যাল মাইল = ১.৮৫২ কিলোমিটার)।অর্থাৎ বাংলাদেশের উপকূলীয় ভূখণ্ড সমুদ্রে ৩৫০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে, যার ভৌগোলিক নাম মহীসোপান। **(35 Preli)**

সীমা :

বাংলাদেশের উত্তরে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, মেঘালয় ও আসাম রাজ্য; পূর্বে আসাম, ত্রিপুরা, মিজোরাম রাজ্য ও মায়ানমার; দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর এবং পশ্চিমে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য অবস্থিত। এর মধ্যে ভারত-বাংলাদেশের সীমারেখার দৈর্ঘ্য ৩৭১৫.১৮ কিলোমিটার। বাংলাদেশ-মায়ানমার সীমারেখার দৈর্ঘ্য ২৮০ কিলোমিটার এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের তটরেখার দৈর্ঘ্য ৭১৬ কিলোমিটার।

বঙ্গোপসাগরে সামুদ্রিক সম্পদ:

বাংলাদেশের ৭১৬ কিলোমিটার দীর্ঘ উপকূলীয় অঞ্চলের বঙ্গোপসাগরে রয়েছে অনেক সামুদ্রিক সম্পদ। এর সমুদ্র তলদেশে ৪৪২ প্রজাতির মৎস্য, ৩৩৬ প্রজাতির মলাস্কস(Mollusks), ১৯ প্রজাতির চিংড়ি, নানারকম কাঁকড়া, ম্যানগ্রোভ বনসহ আরও বিভিন্ন ধরনের সামুদ্রিক জলজ উদ্ভিদ।কক্সবাজারের উপকূলীয় এলাকায় পারমাণবিক খনিজ জিরকন, মোনাজাইট, ইলমেনাইট, ম্যাগনেটাইট, রিওটাইল ও লিউকক্সেন পাওয়া গেছে।এছাড়া সমুদ্র তলদেশে রয়েছে খনিজ তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস সম্পদ।

বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতির ভিন্নতা

ভূপ্রকৃতির ভিন্নতার ভিত্তিতে বাংলাদেশকে প্রধানত তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়।

১।টারশিয়ারী যুগের পাহাড়সমূহ

২।প্লাইস্টোসিনকালের সোপানসমূহ

৩।সাম্প্রতিককালের প্লাবন সমভূমি

১।টারশিয়ারী যুগের পাহাড়সমূহ : বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব, উত্তর ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়সমূহ এ অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত।টারশিয়ারী যুগে হিমালয় পর্বত উত্থিত হওয়ার সময় এ সকল পাহাড় সৃষ্টি হয়েছে। এ অঞ্চলের পাহাড়গুলোকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে।যথা- (ক) দক্ষিণপূর্বাঞ্চলের পাহাড়সমূহ ও (খ) উত্তর ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়সমূহ।

(ক) দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়সমূহ : রাঙামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, কক্সবাজার ও চট্টগ্রাম জেলার পূর্বাংশ এ অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত।

(খ) উত্তর ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়সমূহ : ময়মনসিংহ ও নেত্রকোনা জেলার উত্তরাংশ, সিলেট জেলার উত্তর ও উত্তরপূর্বাংশ এবং মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলার দক্ষিণের পাহাড়গুলোর গড় উচ্চতা ২৪৪ মিটারের বেশি নয়।উত্তরের পাহাড়গুলো স্থানীয়ভাবে টিলা নামে পরিচিত।

২।প্লাইস্টোসিনকালের সোপানসমূহ: আনুমানিক ২৫,০০০ বছর পূর্বের সময়কে প্লাইস্টোসিনকাল বলে।উত্তরপশ্চিমাংশের বরেন্দ্রভূমি, মধ্যভাগের মধুপুর ও ভাওয়ালের গড় এবং কুমিল্লা জেলার লালমাই পাহাড় বা উচ্চভূমি এঅঞ্চলের অন্তর্গত।প্লাইস্টোসিনকালে এসব সোপান গঠিত হয়েছিল বলে ধারণা করা হয়।নিচে এসব উচ্চভূমির বর্ণনা দেওয়া হলো।

(ক) বরেন্দ্রভূমি: দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের প্রায় ৯,৩২০ বর্গকিলোমিটার এলাকায় বরেন্দ্রভূমি বিস্তৃত।প্লাবন সমভূমি হতে এর উচ্চতা ৬ খেকে ১২ মিটার।এ স্থানের মাটি ধূসর ও লাল বর্ণের।

(খ) মধুপুর ও ভাওয়ালের গড়: টাঙ্গাইল ও ময়মনসিংহ জেলায় মধুপুর এবং গাজীপুর জেলায় ভাওয়ালের গড় অবস্থিত।এর আয়তন প্রায় ৪,১০৩ বর্গকিলোমিটার।সমভূমি থেকে এর উচ্চতা প্রায় ৩০ মিটার।মাটির রং লালচে ও ধূসর।

(গ) লালমাই পাহাড়: কুমিল্লা শহর থেকে ৮ কিলোমিটার পশ্চিমে লালমাই থেকে ময়নামতি পর্যন্ত এ পাহাড়টি বিস্তৃত।এর আয়তন প্রায় ৩৪ বর্গকিলোমিটার এবং গড় উচ্চতা ২১ মিটার।

৩।সাম্প্রতিককালের প্লাবন সমভূমি : টারশিয়ারী যুগের পাহাড়সমূহ এবং প্লাইস্টোসিনকালের সোপানসমূহ ছাড়া সমগ্র বাংলাদেশ নদীবিধৌত এক বিস্তীর্ণ সমভূমি।অসংখ্য ছোট-বড় নদী, বাংলাদেশের সর্বত্র জালের মতো ছড়িয়ে রয়েছে। এ প্লাবন সমভূমির আয়তন প্রায় ১,২৪,২৬৬ বর্গকিলোমিটার।এ সমভূমি বাংলাদেশের উত্তর অংশ থেকে উপকূলের দিকে ক্রমনিম্ন।সুন্দরবন অঞ্চল প্রায় সমুদ্র সমতলে অবস্থিত।সমুদ্র সমতল থেকে বাকি অঞ্চলগুলো যেমন- দিনাজপুরের উচ্চতা ৩৭.৫০ মিটার, বগুড়ার উচ্চতা ২০ মিটার, ময়মনসিংহের উচ্চতা ১৮ মিটার এবং নারায়ণগঞ্জ ও যশোরের উচ্চতা ৮ মিটার।এ অঞ্চলগুলোর মাটি খুব উর্বর বলে কৃষিজাত দ্রব্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে তা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে।

বাংলাদেশের প্রধান নদ-নদী

উপনদী ও শাখানদীসহ বাংলাদেশের নদীর মোট দৈর্ঘ্য হলো প্রায় ২২,১৫৫ কিলোমিটার।

পদ্মা : বাংলাদেশের অন্যতম বৃহত্তম নদী পদ্মা।গঙ্গা নদী হিমালয়ের গঙ্গোত্রী হিমবাহ থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে।এরপর প্রথমে দক্ষিণ-পশ্চিম ও পরে দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে প্রবাহিত হয়ে ভারতের হরিদ্বারের নিকট সমভূমিতে পড়েছে।এরপর ভারতের উত্তর প্রদেশ ও বিহার রাজ্যের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার ধুলিয়ান নামক স্থানে ভাগীরথী (হুগলি নদী) নামে এর একটি শাখা বের হয়ে পশ্চিমবঙ্গের মধ্য দিয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে।গঙ্গা নদীর মূল প্রবাহ রাজশাহী অঞ্চলের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে প্রায় ১৪৫ কিলোমিটার পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের সীমানা বরাবর এসে কুষ্টিয়ার উত্তরপশ্চিম প্রান্তে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে।এরপর দৌলতদিয়ার নিকট যমুনা নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে।গঙ্গার মূল ধারা হওয়াতে দৌলতদিয়া পর্যন্ত এইবাংলাদেশের এ অঞ্চলগুলোর মাটি খুব উর্বর বলে কৃষিজাত দ্রব্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে তা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে।এরপর দৌলতদিয়ার নিকট যমুনা নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে।গঙ্গার মূল ধারা হওয়াতে দৌলতদিয়া পর্যন্ত এই বাংলাদেশের নদ-নদী নদীটি গঙ্গা নদী নামেই পরিচিত।তবে বাংলাদেশে প্রবেশের পর থেকেই স্থানীয়ভাবে অনেকে একে পদ্মা নামে চেনে।গঙ্গা ও যমুনার মিলিত ধারা পদ্মা নামে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়ে চাঁদপুরের কাছে মেঘনার সঙ্গে মিলিত হয়েছে।এই তিন নদীর মিলিত প্রবাহ মেঘনা নামে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে। কুমার, মাথাভাঙা, ভৈরব, গড়াই, মধুমতী, আড়িয়াল খাঁ ইত্যাদি গঙ্গা-পদ্মা নদীর প্রধান উপনদী।পুনর্ভবা, নাগর, পাগলা, কুলিক ও ট্যাংগন মহানন্দার উপনদী।

ব্রহ্মপুত্র : এ নদ হিমালয় পর্বতের কৈলাস শৃঙ্গের নিকটে মানস সরোবর থেকে উৎপনড়ব হয়ে প্র মে তিব্বতের উপর দিয়ে পূর্ব দিকে ও পরে আসামের ভিতর দিয়ে পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়েছে।অতঃপর ব্রহ্মপুত্র কুড়িগ্রাম জেলার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে।এরপর দেওয়ানগঞ্জের কাছে দক্ষিণ-পূর্বে বাঁক নিয়ে ময়মনসিংহ জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ভৈরববাজারের দক্ষিণে মেঘনায় পতিত হয়েছে।ধরলা ও তিস্তা ব্রহ্মপুত্রের প্রধান উপনদী এবং বংশী ও শীতলক্ষ্যা প্রধান শাখানদী।

যমুনা : ময়মনসিংহ জেলার দেওয়ানগঞ্জের কাছে ব্রহ্মপুত্রের শাখা যমুনা নদী নামে দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে দৌলতদিয়ার কাছে গঙ্গার সঙ্গে মিলিত হয়ে পদ্মা নাম ধারণ করে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়।করতোয়া ও আত্রাই যমুনার প্রধান উপনদী।ধলেশ্বরী এর শাখানদী এবং ধলেশ্বরীর শাখানদী বুড়িগঙ্গা।

মেঘনা : আসামের বরাক নদী নাগা-মণিপুর অঞ্চল থেকে উৎপন্ন হয়ে সুরমা ও কুশিয়ারা নামে বিভক্ত হয়ে বাংলাদেশের সিলেট জেলায় প্রবেশ করেছে।উত্তরের শাখা সুরমা পশ্চিম দিকে সিলেট, ছাতক, সুনামগঞ্জ শহরের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। আজমিরীগঞ্জের কাছে উত্তর সিলেটের সুরমা, দক্ষিণ সিলেটের কুশিয়ারা নদী এবং হবিগঞ্জের কালনী নদী একসঙ্গে মিলিত হয়েছে।পরে কালনী, সুরমা ও কুশিয়ারার মিলিত প্রবাহ কালনী নামে দক্ষিণে কিছুদূর প্রবাহিত হয়ে মেঘনা নাম ধারণ করেছে।মেঘনা ভৈরববাজারের দক্ষিণে পুরাতন ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে মিলিত হয়ে দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রবাহিত হয়েছে এবং চাঁদপুরের কাছে পদ্মার সঙ্গে মিলিত হয়ে মেঘনা নামে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে।বাংলাদেশে মেঘনা বিধৌত অঞ্চল হচ্ছে ২৯,৭৮৫ বর্গকিলোমিটার।মনু, বাউলাই, তিতাস, গোমতী মেঘনার উপনদী।

কর্ণফুলী : আসামের লুসাই পাহাড় থেকে উৎপনড়ব হয়ে প্রায় ২৭৪ কিলোমিটার দীর্ঘ কর্ণফুলী নদী রাঙামাটি ও চট্টগ্রাম অঞ্চলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। এটি চট্টগ্রাম ও রাঙামাটির প্রধান নদী।কর্ণফুলীর প্রধান উপনদী কাসালাং, হালদা এবং বোয়ালখালি।

সাঙ্গু : এ নদীর উৎপত্তি আরাকান পাহাড়ে।মায়ানমার ও বাংলাদেশ সীমানায় আরাকান পাহাড় থেকে উৎপন্ন হয়ে বান্দরবান ও চট্টগ্রামের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে কর্ণফুলী নদীর মোহনার দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে।

ফেনী : ফেনী নদী ফেনী জেলায় অবস্থিত।এ নদীর উৎপত্তিস্থল পার্বত্য ত্রিপুরায়।ফেনী জেলার পূর্ব সীমা দিয়ে সন্দ্বীপের উত্তরে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে।

সাঙ্গু : এ নদীর উৎপত্তি আরাকান পাহাড়ে।মায়ানমার ও বাংলাদেশ সীমানায় আরাকান পাহাড় থেকে উৎপন্ন হয়ে বান্দরবান ও চট্টগ্রামের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে কর্ণফুলী নদীর মোহনার দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে।

জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য ও প্রভাব

বাংলাদেশের জলবায়ু সাধারণত সমভাবাপন্ন।দেশের মাঝামাঝি দিয়ে কর্কটক্রান্তি রেখা অতিক্রম করায় এখানে ক্রান্তীয় জলবায়ু বিরাজ করে।কিন্তু মৌসুমি বায়ুর প্রভাব এ দেশের জলবায়ুর উপর এত বেশি যে সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশের জলবায়ু ক্রান্তীয় মৌসুমি জলবায়ু নামে পরিচিত।মৌসুমি জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য হলো বছরে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ঋতুর আবির্ভাব।উষ্ণ ও আর্দ্র গ্রীষ্মকাল এবং শুষ্ক শীতকাল বাংলাদেশের জলবায়ুর প্রধান বৈশিষ্ট্য।বাংলাদেশে বার্ষিক গড় তাপমাত্রা ২৬.০১০ সেলসিয়াস এবং গড় বৃষ্টিপাত ২০৩ সেন্টিমিটার।মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে জুন থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত বৃষ্টিপাত হয়।বাংলাদেশের সিলেট অঞ্চলে সবচেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত হয়।বাংলাদেশের জলবায়ুকে মৌসুমি বায়ুপ্রবাহ, বৃষ্টিপাত ও বার্ষিক তাপমাত্রার ভিত্তিতে তিনটি ঋতুতে ভাগ করা হয়েছে।যথা- (ক) গ্রীষ্মকাল, (খ) বর্ষাকাল ও (গ) শীতকাল।

(ক) গ্রীষ্মকাল : বাংলাদেশে মার্চ থেকে মে মাস (ফাল্গুন-জ্যৈষ্ঠ) পর্যন্ত গ্রীষ্মকাল।বাংলাদেশের সবচেয়ে উষ্ণ ঋতু হলো গ্রীষ্মকাল।এ সময়ে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৪০ সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২১০ সেলসিয়াস।গড় হিসেবে এপ্রিল মাসে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২৮০ সেলসিয়াস পরিলক্ষিত হয়।এপ্রিল উষ্ণতম মাস, এ সময় সমুদ্র উপকূল থেকে দেশের অভ্যন্তরভাগে তাপমাত্রা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে কালবৈশাখী ঝড় গ্রীষ্মকালীন আবহাওয়ার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।এই ঝড় বজ্রবিদ্যুৎসহ প্রবল বেগে মার্চ-এপ্রিল মাসে প্রবাহিত হয়।বাংলাদেশের এক-পঞ্চমাংশ বৃষ্টিপাত কালবৈশাখীর মাধ্যমে সংঘটিত হয়।বাংলাদেশে বার্ষিক বৃষ্টিপাতের শতকরা প্রায় ২০ ভাগ গ্রীষ্মকালে হয়। গ্রীষ্মকালে উত্তর গোলার্ধে সূর্যের উত্তরায়ণের জন্য বায়ুচাপের পরিবর্তন ঘটে।এ সময় বাংলাদেশে দক্ষিণ দিক থেকে আগত উষ্ণ ও আর্দ্র বায়ুপ্রবাহ অধিক উত্তাপের প্রভাবে উপরে উঠে উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে আগত শীতল ও শুষ্ক বায়ুপ্রবাহের সঙ্গে সংঘর্ষে বজ্রসহ ঝড়বৃষ্টি হয়।

(খ) বর্ষাকাল : বাংলাদেশে জুন থেকে অক্টোবর মাস (জ্যৈষ্ঠ-কার্তিক) পর্যন্ত বর্ষাকাল। অর্থাৎ গ্রীষ্ম ও শীতের মাঝামাঝি বৃষ্টিবহুল সময়কে বর্ষাকাল বা বর্ষা ঋতু বলে। গড় তাপমাত্রা ২৭০ সেলসিয়াস। মোট বৃষ্টিপাতের প্রায় ৮০ ভাগ এ সময়ে হয়। জুন মাসে বাংলাদেশের উপর সূর্যের অবস্থানের কারণে বায়ুচাপের পরিবর্তন ঘটে। বাংলাদেশের বঙ্গোপসাগর থেকে আগত দক্ষিণ-পশ্চিম অয়ন বায়ু প্রবাহিত হতে শুরু করলে বর্ষাকাল আরম্ভ হয়। এ সময় উত্তর-পূর্ব অয়ন বায়ু অন্তর্হিত হয় এবং দক্ষিণ-পূর্ব অয়ন বায়ু নিরক্ষরেখা অতিক্রম করলে ফেরেলের সূত্র অনুসারে উত্তর গোলার্ধে ডান দিকে বেঁকে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুতে পরিণত হয়। বর্ষা শেষে বাংলাদেশে মাঝে মাঝে ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানে।

(গ) শীতকাল : সাধারণত এ দেশে নভেম্বরের শেষ থেকে ফেব্রুয়ারী মাস (কার্তিক-ফাল্গুন) পর্যন্ত সময়কে শীতকাল বলে। সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসের পর তাপমাত্রা কমতে থাকে। জানুয়ারি মাসে তাপমাত্রা সর্বনিম্ন থাকে ।

জানুয়ারি শীতলতম মাস এবং এ মাসের গড় তাপমাত্রা ১৭.৭০ সেলসিয়াস। শীতকালে দেশের উপকূল ভাগ থেকে উত্তর দিকে তাপমাত্রা কম থাকে। বাংলাদেশের ইতিহাসে ১৯০৫ সালে দেশের উত্তরাঞ্চলে দিনাজপুরে সর্বনিম্ন ১০ সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছিল। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ এ সময়ে ১০ সেন্টিমিটারের অধিক নয়। এ সময় বাতাসের সর্বনিম্ন আর্দ্রতা শতকরা প্রায় ৩৬ ভাগ। দেশের উত্তরাঞ্চলের উপর দিয়ে কখনো কখনো তীব্র শীতল বায়ু প্রবাহিত হওয়ার ফলে বেশ শীত অনুভূত হয়।

একাদশ অধ্যায়

বাংলাদেশের সম্পদ ও শিল্প

বাংলাদেশের কৃষিজ ফসল
খাদ্য-শস্য: (ধান, গম, ডাল, তেলবীজ, আলু, ভুট্টা, সবজি, ফলমূল)
অর্থকরী ফসল: (পাট, চা, ইক্ষু, তুলা, তামাক, ফুল)

ধান : বাংলাদেশের খাদ্য-শস্যের মধ্যে ধানই প্রধান। এ দেশে আউশ, আমন, বোরো প্রভৃতি ধরনের ধান চাষ হয়। বাংলাদেশের সকল জেলায় ধান উৎপাদিত হয়। রংপুর, কুমিল্লা, সিলেট, যশোর, কিশোরগঞ্জ, রাজশাহী, বরিশাল, ময়মনসিংহ, বগুড়া, দিনাজপুর, ঢাকা, নোয়াখালি প্রভৃতি অঞ্চলে ধান চাষ বেশি হয় (চিত্র ১১.১)। তবে রংপুরে আমন ধান ও সিলেটে বোরো ধান ভালো হয়। নদী অববাহিকায় পলিমাটি ধান চাষের জন্য বিশেষ উপযোগী।

গম : বাংলাদেশের প্রায় সব অঞ্চলেই গম চাষ হয়। তবে উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলো গম চাষের জন্য বিশেষ উপযোগী। দিনাজপুর, পাবনা, রংপুর, রাজশাহী, কুষ্টিয়া, যশোর, বগুড়া প্রভৃতি অঞ্চলে গম চাষ ভালো হয় (চিত্র ১১.১)।
অন্যান্য খাদ্য-শস্যের মধ্যে তেলবীজ (তিল, সরিষা, বাদাম, তিসি) এবং ডাল (মসুর, মুগ, মটর, মাসকলাই, খেসারি) এবং ভুট্টা, যব, আলু, সবজি, ফলমূল প্রধান।

পাট: পাট বাংলাদেশের প্রধান অর্থকরী ফসল। বাংলাদেশে সাধারণত দুই প্রকার পাট চাষ হয়, দেশি এবং তোষা পাট। রংপুর, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, কুমিল্লা, যশোর, ঢাকা, কুষ্টিয়া, জামালপুর, টাঙ্গাইল, পাবনা প্রভৃতি জেলায় পাট চাষ ভালো হয়।

ইক্ষু : চিনি, গুড় উৎপাদনের জন্য ইক্ষু বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ ফসল। ইক্ষু চাষের জন্য সমতলভূমি প্রয়োজন। রাজশাহী, রংপুর, দিনাজপুর, পাবনা, কুষ্টিয়া, ফরিদপুর, ঢাকা, যশোর, ময়মনসিংহ ইক্ষু চাষের প্রধান অঞ্চল

চা: বাংলাদেশের অর্থকরী ফসলের মধ্যে চা অন্যতম। দেশে উৎপাদিত চা-এর প্রায় বেশিরভাগ বিদেশে রপ্তানি হয়। পানি নিষ্কাশনবিশিষ্ট ঢালু জমিতে চা ভালো হয়। মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, সিলেটে সবচেয়ে বেশি চা বাগান রয়েছে। এছাড়া চট্টগ্রাম, রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান, ঠাকুরগাঁও ও পঞ্চগড়ে চা চাষ হচ্ছে

বাংলাদেশের বনাঞ্চল :
কোনো দেশের পারস্পরিক ভারসাম্য এবং অর্থনৈতিক উনড়বয়নের জন্য মোট ভূমির ২৫ ভাগ বনভূমি থাকা প্রয়োজন। কিন্তু ২০১১-১২ সালের হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশে বনভূমির পরিমাণ শতকরা ১৩ ভাগ। জলবায়ু ও মাটির গুণাগুণের তারতম্যের কারণে বাংলাদেশের বনভূমিকে তিন শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়

খনিজ তেল (Petreolium): বাংলাদেশের উপকূল অঞ্চলে খনিজ তেল আছে বলে বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন। ১৯৮৬ সালে সিলেট জেলার হরিপুরে প্রাকৃতিক গ্যাসের সপ্তম কূপে তেল পাওয়া গেছে। অপরিশোধিত তেল চট্টগ্রামের তেল শোধনাগারে পরিশোধন করা হয়। পরিশোধিত তেল থেকে পেট্রোল, কেরোসিন,বিটুমিন ও অন্যান্য দ্রব্য পাওয়া যায়। মৌলভীবাজার জেলার বরমচালে বাংলাদেশের দ্বিতীয় তেলক্ষেত্রটি অবস্থিত।

প্রাকৃতিক গ্যাস (Natural Gas): দেশের মোট বাণিজ্যিক জ্বালানি ব্যবহারের প্রায় ৭৫ শতাংশ প্রাকৃতিক গ্যাস পূরণ করে।

কয়লা (Coal): রংপুরের খালাসপীর, ফুলবাড়ি দীঘিপাড়া এবং বগুড়ার জামালগঞ্জে কয়লাক্ষেত্র রয়েছে
বাংলাদেশের ফরিদপুরে বাঘিয়া ও চান্দা বিল, খুলনার কোলা বিল এবং সিলেটের কিছু অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে পীট জাতীয় নিম্নমানের কয়লার সন্ধান পাওয়া গেছে।এছাড়া রাজশাহী, বগুড়া, নওগাঁ এবং সিলেট জেলায় উৎকৃষ্টমানের বিটুমিনাস ও লিগনাইট কয়লার সন্ধান পাওয়া গেছে।দিনাজপুরে বড়পুকুরিয়ার কয়লাক্ষেত্র থেকে উৎকৃষ্টমানের লিগনাইট কয়লা উত্তোলন করা হচ্ছে।

কঠিন শিলা (Hard Rock): রংপুর জেলার রানীপুকুর ও শ্যামপুর এবং দিনাজপুর জেলার মধ্যপাড়ায় কঠিন শিলার সন্ধান পাওয়া গেছে।রংপুরের রানীপুকুর থেকে বৈদেশিক সহযোগিতায় শিলা উত্তোলনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বাংলাদেশের প্রধান শিল্প:
১৯৫১ সালে ১,০০০ তাঁত নিয়ে নারায়ণগঞ্জের আদমজীনগরে প্রথম পাটকলটি প্রতিষ্ঠিত হয়।

বস্ত্র শিল্প: কার্পাস বয়নশিল্প বাংলাদেশের দ্বিতীয় প্রধান গুরুত্বপূর্ণ শিল্প।

কাগজ শিল্প: ১৯৫৩ সালে বাংলাদেশের চন্দ্রঘোনায় প্র ম কাগজের কল স্থাপিত হয়।বর্তমানে বাংলাদেশে ৬টি কাগজকল, ৪টি বোর্ড মিল ও ১টি নিউজপ্রিন্ট কারখানা আছে

সার শিল্প: ১৯৫১ সালে বাংলাদেশে প্রম সার কারখানা সিলেটের ফেঞ্চুগঞ্জে স্থাপিত হয়।বর্তমানে ১৭টি সার কারখানা থেকে সার উৎপাদন হচ্ছে।এর মধ্যে প্রধান সার কারখানাগুলো হলো- ঘোড়াশাল সার কারখানা, আশুগঞ্জ সার কারখানা, পলাশ ইউরিয়া সার কারখানা, চট্টগ্রাম ট্রিপল সুপার ফসফেট সার কারখানা, চট্টগ্রাম ইউরিয়া সার কারখানা, জামালপুর জেলার তারাকান্দিতে যমুনা সার কারখানা ও ফেঞ্চুগঞ্জ অ্যামোনিয়াম সালফেট সার কারখানা

পোশাক শিল্প : সত্তর দশকের শেষে এবং আশির দশকের প্রথম থেকে রপ্তানিমুখী পোশাক শিল্পের যাত্রা শুরু হয়।এ শিল্পে জাপান, কোরিয়া, হংকং, থাইল্যান্ড, চীন, ইন্দোনেশিয়া, সিঙ্গাপুর, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, কানাডা প্রভৃতি দেশ বিনিয়োগ করেছে।চট্টগ্রাম ও ঢাকার ইপিজেড () দুইটি কেন্দ্রীয় বর্জ্য শোধনাগার নির্মাণের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।এগুলো স্থাপনের মাধ্যমে পরিবেশ দূষণ রোধ করা সম্ভব হবে।

বাংলাদেশের পর্যটন শিল্প: প্রাকৃতিক ঋতু বৈচিত্র্যের দেশ বাংলাদেশ।সপ্তম শতাব্দীতে প্রখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক কবি হিউয়েন সাং এই দেশে এসে উচ্ছ্বসিতভাবে উল্লেখ করেছেন, "A sleeping beauty emerging from mists and water." তিনি তখন এই জনপদের সুপ্ত সৌন্দর্যটিকে কুয়াশা ও পানির অন্তরাল থেকে ক্রমশ উন্মোচিত হতে দেখেছিলেন।

বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন কেন্দ্রসমূহ:
বৃহত্তর ঢাকার পর্যটন স্থানসমূহ: সপ্তদশ শতাব্দীতে নির্মিত সাত গম্বুজ, অষ্টাদশ শতাব্দীর তারা মসজিদ এবং সাম্প্রতিককালের নির্মিত বায়তুল মোকাররম জামে মসজিদ।একাদশ শতাব্দীতে নির্মিত ঢাকেশ্বরী মন্দির।মোগল সম্রাটদের বুড়িগঙ্গার নির্মিত লালবাগ দুর্গ, ১৮৫৭ সালের স্মৃতিসৌধ বাহাদুর শাহ পার্ক, আহসান মঞ্জিল জাদুঘর, কার্জন হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক স্থাপত্যসমূহ, জাতীয় কবির সমাধি, জাতীয় সংসদ ভবন, কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার, জাতীয় স্মৃতিসৌধ, মীরপুর বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ, রায়েরবাজার বধ্যভূমি, ধানমণ্ডিতে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর প্রতিকৃতি ও মিউজিয়াম, ১৯৭১ সালের মহান স্বাধীনত যুদ্ধের জাতির জনক কর্তৃক ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ স্থল সোহরাওয়ার্দী উদ্যান ইত্যাদি পর্যটকদের জন্য বিশেষ আকর্ষণ।গাজীপুরের ভাওয়াল গড় ও জমিদারবাড়ি, নারায়ণগঞ্জের ঐতিহাসিক সোনারগাঁও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

পূর্ববঙ্গের পর্যটন স্থানসমূহ: টাঙ্গাইলের আটিয়া মসজিদ, মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানীর মাজার ও বঙ্গবন্ধু সেতু, মধুপুরের গড়, ময়মনসিংহের ত্রিশালে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম-এর স্মৃতি বিজরিত দরিরামপুর।সিলেটে হযরত শাহজালাল (রাঃ) ও শাহপরান (রাঃ) মাজার, কিন ব্রিজ, জাফলং-এ জৈন্তা পাহাড়, মৌলভীবাজারে মাধবকুণ্ড জলপ্রপাত,লাউয়াছড়া ইকোপার্ক ইত্যাদি।কুমিল্লার ময়নামতি বৌদ্ধ ও শালবন বিহার এবং ২য় বিশ্বযুদ্ধের সৈনিকদের সমাধিস্থল, নোয়াখালির বজরা শাহী মসজিদ, গান্ধী আশ্রম, হাতিয়া ও নিঝুম দ্বীপ ইত্যাদি।

উত্তরবঙ্গের পর্যটন স্থানসমূহ: রাজশাহী বরেন্দ্র জাদুঘর ও শাহ মখদুম (রাঃ) মাজার, চাপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জে সোনা মসজিদ, নাটোরের রানি ভবানীর বাড়ি ও দিঘাপাতিয়া রাজবাড়ি (উত্তরা গণভবন), নওগাঁয় পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহার, খ্রিষ্টপূর্ব ৩য় শতকে নির্মিত বগুড়ার মহাস্থানগড় ও শাহ সুলতান বলখী (রাঃ) মাজার, পায়রাবন্দে বেগম রোকেয়ার বাড়ির ধ্বংসাবশেষ, দিনাজপুরে কান্তজি মন্দির ইত্যাদি।

দক্ষিণবঙ্গের পর্যটন স্থানসমূহ: গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর মাজার, কুষ্টিয়ার হার্ডিঞ্জ ব্রিজ, মরমী কবি লালনশাহের মাজার ও শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথের কুঠিবাড়ি, যশোরের সাগরদাড়িতে কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের জন্মস্থান, নড়াইলে চিত্রশিল্পী এস এম সুলতান 'শিশু স্বর্গ ও আর্ট গ্যালারী' চিত্রা নদীর তীরে, মেহেরপুরে মুজিবনগর স্মৃতিসৌধ, বাগেরহাট ষাট গম্বুজ মসজিদ, পটুয়াখালির কুয়াকাটা সমুদ্রসৈকত, বৃহত্তর খুলনায় অবস্থিত প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট সুন্দরবন ইত্যাদি।রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানের পর্যটন স্থানসমূহ রাঙামাটির কাপ্তাই হ্রদ এখানকার প্রধান আকর্ষণ।এই হ্রদের চারদিকে সবুজ ঘেরা পাহাড়, নীলাভ পানি এবং হ্রদের ধারে ছোট ছোট টিলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য পর্যটকদের কাছে অনাবিল আনন্দ উপভোগের এক মোহনীয় মায়াময় স্থানে রূপান্তরিত করেছে।এখানে বৌদ্ধবিহার ও চাকমা রাজার রাজবাড়ি অন্যতম দর্শনীয় স্থান।খাগড়াছড়ির বনভূমি, পাহাড় ও প্রাকৃতিক ঝরনা।বান্দরবানের মেঘলা, শৈলপ্রপাত, নীলগিরি ও নীলাচল পর্যটন স্পট এবং মাতামুহুরী নদী ইত্যাদি। **(35 Preli)**

চট্টগ্রামের পর্যটন স্থানসমূহ: চট্টগ্রামের আকর্ষণীয় পর্যটন স্থানগুলো হচ্ছে হযরত শাহ আমানত (রাঃ) মাজার, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সৈনিকদের সমাধিস্থল, ফয়'স লেক, পাহাড়তলী বধ্যভূমি, ডিসি হিল, কোর্ট বিল্ডিং, কর্ণফুলী নদী, পতেঙ্গা সৈকত, সীতাকুণ্ড, সন্দ্বীপ দ্বীপ ইত্যাদি।

কক্সবাজার এলাকার পর্যটন স্থানসমূহ: পৃথিবীর দীর্ঘতম সমুদ্রসৈকত ও বনভূমির নয়নাভিরাম দৃশ্য কক্সবাজারকে একটি আকর্ষণীয় পর্যটন কেন্দ্রে পরিণত করেছে। ১২০ কিলোমিটার দীর্ঘ সৈকতের সঙ্গে তীর ঘেঁষে রয়েছে সংরক্ষিত বনভূমি এবং পরিবেষ্টিত রয়েছে প্রায় ৯৬ কিলোমিটার নিরবচ্ছিন্ন পাহাড়ের সারি।কক্সবাজারের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন স্থান হলো হিমছড়ি, সোনাদিয়া দ্বীপ, মহেশখালি দ্বীপ ও সেন্টমার্টিন দ্বীপ।

দ্বাদশ অধ্যায়

বাংলাদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা ও বাণিজ্য

রেলপথ: বাংলাদেশে সর্বমোট ৪৪০টি রেলস্টেশন আছে খাগড়াছড়ি, রাঙামাটি, বান্দরবান, বরিশাল, পটুয়াখালি, মাদারিপুর, শরীয়তপুর, মেহেরপুর, কক্সবাজার ও লক্ষ্মীপুর অঞ্চলে কোনো রেলপথ নেই।

নদীপথ: প্রায় ৮,৪০০ কিলোমিটার দীর্ঘ অভ্যন্তরীণ নাব্য জলপথ আছে। এর মধ্যে প্রায় ৫,৪০০ কিলোমিটার সারাবছর নৌ-চলাচলের উপযুক্ত থাকে। অবশিষ্ট ৩,০০০ কিলোমিটার শুধু বর্ষাকালে ব্যবহার করা যায়।দেশের দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলের নদীগুলো নৌ- চলাচলের জন্য বেশি উপযোগী।

সমুদ্রপথ: বাংলাদেশের দুটি সমুদ্রবন্দর আছে- চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দর।চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে দেশের মোট আমদানির প্রায় ৮৫ শতাংশ এবং রপ্তানির ৮০ শতাংশ বাণিজ্য সম্পন্ন হয়।মংলা বন্দর দিয়ে মোট রপ্তানির প্রায় ১৩ শতাংশ এবং আমদানির প্রায় ৮ শতাংশ বাণিজ্য সম্পন্ন হয়।

আকাশপথ: বিমানের অভ্যন্তরীণ সার্ভিসে ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, সিলেট, যশোর, রাজশাহী, সৈয়দপুর, বরিশাল প্রভৃতি স্থানে যাতায়াত করা যায়

বৈদেশিক বাণিজ্য

বর্তমানে আমাদের রপ্তানির প্রায় শতকরা ৭৫ ভাগ আয় হচ্ছে তৈরি পোশাক ও নিটওয়্যার থেকে এবং দিন দিন কৃষিপণ্য রপ্তানির পরিমাণ কমে আমদানি বাড়ছে।
বৈদেশিক বাণিজ্যে রপ্তানি বৃদ্ধি করে আমাদের অর্থনৈতিক উন্নতি করার লক্ষ্যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা প্রয়োজন।এজন্যউৎপাদন বৃদ্ধি, পণ্যের মান উন্নয়ন, উৎপাদন ব্যয় হ্রাস, রপ্তানি শুল্ক হ্রাস, পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন, রপ্তানিযোগ্য পণ্যের ব্যাপক প্রচার প্রভৃতি অপরিহার্য।

প্রধান রপ্তানি পণ্যসমূহ

১।প্রাথমিক পণ্য
হিমায়িত খাদ্য, কৃষিজাত পণ্য
২।শিল্পজাত পণ্য
তৈরি পোশাক, নিটওয়্যার, রাসায়নিক দ্রব্য, প্লাস্টিকসামগ্রী, চামড়া, চামড়াজাত পণ্য, হস্তশিল্প, পাট ও পাটজাত পণ্য, হোম টেক্সটাইল, পাদুকা, সিরামিকসামগ্রী, প্রকৌশল দ্রব্যাদি।

আমদানি পণ্যসমূহ

১।প্রধান প্রাথমিক দ্রব্যসমূহ
চাল, গম, ভোজ্যতেল, সার তেলবীজ ক্লিংকার
২।প্রধান শিল্পজাত পণ্যসমূহ
অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম স্টেপল ফাইবার তুলা সুতা
৩।মূলধনী দ্রব্যসমূহ ৪।অন্যান্য পণ্য (ইপিজেড-এর সহায়ক পণ্য)
আমদানি ক্ষেত্রে চীন-এর অবস্থান শীর্ষে। দ্বিতীয় অবস্থানে ভারত, তৃতীয় সিঙ্গাপুর, চর্তুথ ও পঞ্চম যথাক্রমে দক্ষিণ কোরিয়া ও জাপান।

বনজসম্পদ : বনজ সম্পদ কোনো দেশের পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার সবচেয়ে বড় উপাদান।আমাদের দেশের বনভূমির পরিমাণ শতকরা প্রায় ১৩ভাগ।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

বাংলাদেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ও পরিবেশের ভারসাম্য

বন উন্নয়ন ও সংরক্ষণ

বন সংরক্ষণে যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে :

১।নিঃশেষিত পাহাড় এবং খাসজমিতে বনের বিস্তার ঘটানো।

২।গ্রামীণ এলাকায় পতিত ও প্রান্তিক জমিতে বৃক্ষরোপণ।

৩।সড়ক, রেলপথ ও সকল প্রকার বাঁধের পাশে বনায়ন।

৪।বনায়ন ও বনজ সম্পদ সংরক্ষণ, জনগণের সচেতনতাবৃদ্ধি।

৫।জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে বিশেষ প্রকল্প বাস্তবায়ন।

পরিবেশ সংরক্ষণও দূষণনিয়ন্ত্রণে গৃহীত পদক্ষেপ নিম্নরূপ:

১।পলিথিন ব্যাগ উৎপাদন ও ব্যবহার রোধ

২।শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহের উপযুক্ত পরিশোধন ব্যবস্থা গড়ে তোলা

৩।জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য প্রকল্প বাস্তবায়ন

৪।সামাজিক বনায়ন গড়ে তোলা

৫।বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ

৬।বুড়িগঙ্গা বাঁচাও কর্মসূচি

৭।ইটের ভাটায় কাঠ পোড়ানো নিয়ন্ত্রণ

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ

বাংলাদেশে ১১৯ জাতের স্তন্যপায়ী, ৫৭৮ জাতের পাখি, ১২৪ জাতের সরীসৃপ ও ১৯ জাতের উভচরকে শনাক্ত করাহয়েছে।ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অব নেচার কর্তৃক প্রকাশিত রেড ডাটা বুক-এ বাংলাদেশের ২৩টিপ্রজাতির জন্য প্রাণীর অস্তিত্ব হুমকির সম্মুখীন বলে উলে–খ করা হয়েছে।এই তালিকায় রয়েছে রয়েল বেঙ্গল টাইগার, চিতাবাঘ, হাতি, অজগর, কুমির ও ঘড়িয়াল ইত্যাদি।কারো মতে বাংলাদেশে ২৭টি বন্যপ্রাণীর অস্তিত্ব বিপন্ন।আরও৩৯টি প্রজাতি হুমকির সম্মুখীন।উনিশ শতকেই ১৯টি প্রজাতি বাংলাদেশ থেকে নিশ্চিহ্নহয়ে গেছে।এর মধ্যে আছেতিন ধরনের গরু, বুনো মহিষ, এক ধরনের কালো হাঁস, নীল গাই, কয়েক ধরনের হরিণ, রাজশকুনও মিঠা পানিরকুমির ইত্যাদি।

চতুর্দশ অধ্যায়

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগ

দুর্যোগ ও বিপর্যয় (Disaster and Hazard)

বন্যা (Flood)

বাংলাদেশ একটি নদীমাতৃক ও বৃষ্টিবহুল দেশ।এখানে বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ২,৩০০ মিলিমিটার।৫৭টি আন্তর্জাতিক নদীসহ ৭০০টি নদী এ দেশে জালের মতো বিস্তার করে আছে।এর মধ্যে ৫৪টি নদীর উৎসস্থল ভারতে অবস্থিত।

বাংলাদেশে কেন বন্যা হয়?

ভৌগোলিক অবস্থান।উজান থেকে নেমে আসা নদীর পানির প্রচুরতা, মৌসুমি জলবায়ুর প্রভাব।(যেমন- ২০১২ এপ্রিল নেত্রকোনায়) নদী অববাহিকায় ব্যাপক বৃক্ষ কর্তন।মূল নদীর গভীরতা কম। প্রাকৃতিক কারণ কৃত্রিম কারণ গঙ্গা নদীর উপর নির্মিত, ফারাক্কাবাঁধ শাখানদীগুলো পলি দ্বারা আবৃত। অন্যান্য নদীতে নির্মিত, বাঁধের প্রভাব।হিমালয়ের বরফগলা পানি প্রবাহ। অপরিকল্পিত নগরায়ণ। বঙ্গোপসাগরের তীব্র জোয়ার-ভাটা।

ভূমিকম্প

২০০০ সালের বন্যায় দেশের ১৬টি জেলার ১.৮৪ লক্ষ হেক্টর জমির ফসল বিনষ্ট হয়। পৃথিবীর ব-দ্বীপ বাংলাদেশ তথা এ ঢালু সমভূমির দেশে বিভিন্ন শতাব্দীতে বন্যা হয়েছে। ১৯৫৪ থেকে ২০০৪ সালের মধ্যে ১৯৭৪, ১৯৭৮, ১৯৮৪, ১৯৮৮, ১৯৯৮, ২০০৪ সালের বন্যা ছিল ভয়াবহ।এর মধ্যে ১৯৯৮ সালের দীর্ঘস্থায়ী বন্যায় সবচেয়ে বেশি এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বাংলাদেশের প্রধান ৩টি নদীর উৎস চীন, নেপাল, ভারত ও ভুটান।এ ৩টি নদীর মোট অববাহিকা এলাকার পরিমাণ ১৫,৫৪,০০০ বর্গকিলোমিটার, যার মাত্র ৭ শতাংশ এলাকা এ দেশে অবস্থিত।কিন্তু এসব নদী প্রবাহের ৮০ শতাংশেরও বেশি পানি বাইরে থেকে আসে এবং বন্যার জন্য দায়ী ৯০ শতাংশ পানিই এ ৩টি নদী নিয়ে আসে।

খরা

আমাদের দেশে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে খরার প্রভাবে কৃষিজ ফসলের উৎপাদন কমে যায়। খাদ্যদ্রব্যের অভাব হওয়ায় দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়।

ঘূর্ণিঝড়

প্রচণ্ড শক্তিশালী এবং মারাত্মক ধ্বংসকারী বাংলাদেশে সংঘটিত প্রাকৃর্তিক দুর্যোগের মধ্যে ঘূর্ণিঝড় তথা কালবৈশাখী উল্লেখযোগ্য।স্থানঅনুসারে ঘূর্ণিঝড়ের বিভিন্ননামকরণ হয় তাতোমরা পূর্বেই জেনেছ।ঘূর্ণিঝড় কেন্দ্রমুখী ও উর্ধ্বমুখী বায়ুরূপে পরিচিত।এর কেন্দ্রস্থলে নিম্নচাপ এবং চারপাশে উচ্চচাপ বিরাজকরে।বাংলাদেশে আশ্বিন-কার্তিক এবং চৈত্র-বৈশাখ মাসে এ ঘূর্ণিঝড়ের সংঘটন ঘটে বর্ষাকালে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর কারণে ঘূর্ণিঝড় হয় এবং একই ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়।ঘূর্ণিঝড় একটি সাময়িক প্রাকৃতিক দুর্যোগ।গত তিন দশকে বাংলাদেশের পূর্বাংশে বেশি ঘূর্ণিঝড় সংঘটিত হয়েছে।বিশেষ করে চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, টেকনাফ, সন্দ্বীপ, হাতিয়া, কুতুবদিয়া, উরিরচর, চর জব্বার, চর আলেকজান্ডার প্রভৃতি।

নদীভাঙন (River Bank Erosion)

জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাসে মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে প্রবল বৃষ্টিপাতে নদীভাঙনে জমির মালিকগণ সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

ভূমিকম্প (Earthquake)

বাংলাদেশ যেহেতু মহাসাগরগুলো থেকে অনেক দূরে অবস্থিত সেহেতু এ দেশকে সরাসরি সামুদ্রিক ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চল হিসেবে তেমন চিহ্নিত করা যায় না।তবে বাংলাদেশের উত্তরে আসামের খাসিয়া ও জয়ন্তিয়া পাহাড়, হিমালয়ের পাদদেশ, আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ ও বঙ্গোপসাগরের তলদেশে ভূমিকম্প প্রবণতা যথেষ্ট লক্ষ করা যায়। বাংলাদেশের পূর্বাংশে রয়েছে টারশিয়ারী যুগের পাহাড়।উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত স্বল্প ভাঁজবিশিষ্ট ভঙ্গিল প্রকৃতির পাহাড়গুলোকে আসামের লুসাই এবং মায়ানমারের আরাকান পাহাড়ের সমগোত্রীয় বলে ধরা হয়।এ পাহাড়গুলো বেলেপাথর, সেলপাথর এবং কর্দম দ্বারা গঠিত।গঠনগত কারণে এ চত্বর ভূমিকম্পপ্রবণ। আবার রয়েছে পুরাতন পলল গঠিত প্লাইস্টোসিন কালের সোপানসমূহ-বরেন্দ্রভূমি, মধুপুর ও ভাওয়ালের গড় এবং লালমাই পাহাড়।বাকি অংশ নব গঠিত প্লাবন সমভূমি।সুতরাং ভূতাত্ত্বিক গঠনগত দিক দিয়ে বাংলাদেশ বিশেষত উত্তর ওপূর্ব দিক যথেষ্ট ভূমিকম্প প্রবণ অঞ্চল।উত্তরে হিমালয় চত্বর এবং মালভূমি, পূর্বে মায়ানমার আরাকান ইয়োমার অস্তিত্বএবং উত্তর-পূর্বেনাগা-দিসাং-জাফলং অঞ্চলের সংশি–ষ্টতা অনেক বেশি ভূমিকম্প প্রবণ করে তুলেছে।

১৫৪৮ সাল থেকেই বাংলাদেশ এবং তৎসংলগ্ন অঞ্চলে ভূমিকম্প সংক্রান্তরেকর্ড সংগৃহীত শুরু হয়।ভূমিকম্পের কেন্দ্র উপকেন্দ্রের সঙ্গে তিন ধরনের পরিমাপ সম্পর্কযুক্ত। অগভীর কেন্দ্র (০-৭০ কিলোমিটার), মধ্য পর্যায়ের কেন্দ্র (৭০-৩০০ কিলোমিটার) এবং গভীর কেন্দ্র (১,৩০০ কিলোমিটার)।সুতরাং বাংলাদেশের অভ্যন্তরে উপকেন্দ্র না থাকলেও সংলগ্ন অঞ্চলে ভূমিকম্প হলে তার প্রভাব হিসেবে বাংলাদেশেও ভূকম্পন অনুভূত হয়।

১৯৯৩ সালে সমগ্র বাংলাদেশকে তিনটি ভূকম্পনীয় সংঘটিত অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়েছে।যথা- অঞ্চল ১ (মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ, রিখটার স্কেল মাত্রা ৭) ; অঞ্চল ২ (মাঝারি ঝুঁকিপূর্ণ, রিকটার স্কেল মাত্রা ৬); অঞ্চল ৩ (কম ঝুঁকিপূর্ণ, রিকটার স্কেল মাত্রা ৫)।এ তিনটি অঞ্চলের অধীনে রয়েছে যথাক্রমে উত্তর ও উত্তর-পূর্ব অঞ্চল, মধ্য অঞ্চল এবং দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল।

প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ

১।ভূমিকম্প সম্পর্কে গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ব্যাপক প্রচার প্রয়োজন।
২ সারাদেশে ভবন নির্মাণে জাতীয় ‘বিল্ডিং কোড’ এবং কোডের কাঠামোগত অনুসরণ বাধ্যতামূলক হবে।
৩।ঢাকা শহরে রাজউকের ভবন নির্মাণ প্ল্যানঅনুমোদনের নীতিমালা যুগোপযোগী করা প্রয়োজন।
৪।সারাদেশে রাস্তা প্রশস্ত করতে হবে।
৫।ভূমিকম্প পরবর্তী সময়ে উদ্ধার কাজে ব্যবহারের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো কর্তৃক তালিকা অনুযায়ী যন্ত্রপাতিপ্রত্যেক জেলা প্রশাসকের দপ্তরে সংরক্ষণ করতে হবে।
৬।ঝুঁকিপূর্ণ এলাকাসমূহে স্বেচ্ছাসেবক দলগঠন ও প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে।
৭।দুর্যোগকবলিত এলাকায় উদ্ধার কার্যক্রমের জন্য নৌবাহিনী ও পুলিশ বাহিনীতে ‘ডগ স্কোয়াড’ রাখা।
৮।ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় ফিল্ড হাসপাতাল স্থাপন ও মহড়া অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা।
৯।বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন কর্তৃক সিলেটে নির্মীয়মান কেন্দ্রের সঙ্গে আবহাওয়া অধিদপ্তরের ঢাকা, সিলেট, রংপুর এবং চট্টগ্রাম কেন্দ্রের সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করা।
১০।বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর, আবহাওয়া অধিদপ্তর, সম্পৃক্ত সংস্থাসমূহের সমন্বয়ে প্রাতিষ্ঠানিক গঠন ও উন্নয়ন সাধন।যা পরবর্তীতে জাতীয় ভূমিকম্প গবেষণা কেন্দ্র হিসেবে কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারে।

সুনামি

অতীতে ১৭৬২ সালের ২রা এপ্রিল কক্সবাজার এবং সন্নিহিত অঞ্চলে সুনামির প্রভাব ঘটে।মায়ানমারে আরাকান উপকূলে ৭.৫ মাত্রার ভূমিকম্প সংঘটনের ফলে সুনামির আগমন হয়।১৯৪১ সালে আন্দামান সাগরে ভূমিকম্পের ফলে বঙ্গোপসাগরে সুনামি সংঘটন হয়।তবে এর ফলে প্রচণ্ড আঘাতপ্রাপ্তহয় ভারতের পূর্ব উপকূল।যার পরিণতিতে ৫,০০০ মানুষ প্রাণ হারায়।২০০৪ সালের ২৬শে ডিসেম্বর ইন্দোনেশিয়ার সিনুয়েলুয়ে দ্বীপে সংঘটিত ভূমিকম্পের কারণে যে সুনামির আগমন ঘটে তার প্রভাব বাংলাদেশে ঘটতে দেখা যায় এবং লোকের মৃত্যু ঘটে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা:

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার প্রধান উদ্দেশ্য হলো তিনটি :
(ক) দুর্যোগের সময় জীবন, সম্পদ এবং পরিবেশের যে ক্ষতি হয়ে থাকে তা এড়ানো বা ক্ষতির পরিমাণ হ্রাস করা;
(খ) প্রয়োজন অনুযায়ী ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের মধ্যে অল্প সময়ে সকল প্রকার ত্রাণ পৌছানো ও পুনর্বাসন নিশ্চিত করা এবং
(গ) দুর্যোগ পরবর্তী পুনরুদ্ধার কাজ ভালোভাবে সম্পন্ন করা।

দুর্যোগ প্রতিরোধ, দুর্যোগ প্রশমন এবং দুর্যোগের পূর্বপ্রস্তুতি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার মুখ্য উপাদান।সুতরাং দুর্যোগকে কার্যত মোকাবিলার লক্ষ্যে দুর্যোগপূর্ব সময়েই এর ব্যবস্থাপনার বেশি কাজ সম্পন্ন করতে হয় দুর্যোগ সংঘটনের পরপরই এর ব্যবস্থাপনার অন্যান্য উপাদানের মধ্যে রয়েছে, সাড়াদান, পুনরুদ্ধার ও উন্নয়ন।অতীতে দুর্যোগে সাড়াদানকেই সম্পূর্ণ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বলে ধরে নেওয়া হতো।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন কাজকে পর্যায়ক্রম অনুযায়ী সাজাতে হলে কোন কাজটি সর্বপ্রথমে হবে ? **(35 Preli)**
ক. পুর্নবাসন
খ. ঝুঁকি (Risk) চিহ্নতকরন
গ. দুর্যোগ প্রস্তুতি
ঘ. দুর্যোগ প্রশমন কর্মকাণ্ড

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার পর্যায়ক্রম :

প্রতিরোধ (Prevention) : প্রাকৃতিক দুর্যোগকে সম্পূর্ণরূপে প্রতিরোধ করা সম্ভব না হলেও এর ক্ষয়ক্ষতি কমানোর ব্যাপারে প্রতিরোধ কার্যক্রম সফলতা বয়ে আনতে পারে। দুর্যোগ প্রতিরোধের কাঠামোগত এবং অকাঠামোগত প্রশমনের ব্যবস্থা রয়েছে।কাঠামোগত প্রশমনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন নির্মাণ কার্যক্রম যথা- বেড়িবাঁধ তৈরি, আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, পাকা ও মজবুত ঘর-বাড়ি তৈরি, নদী খনন ইত্যাদি বাস্তবায়নকেই বোঝায়।

প্রশমন (Mitigation) : দুর্যোগের দীর্ঘস্থায়ী হ্রাস এবং দুর্যোগ পূর্বপ্রস্তুতিকেই দুর্যোগ প্রশমন বলে।মজবুত পাকা ভবন নির্মাণ, শস্য বহুমুখীকরণ, ভূমি ব্যবহারে বিপর্যয় হ্রাসের কৌশল নির্ধারণ, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, শক্ত অবকাঠামো নির্মাণ, কম ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় লোক স্থানান্তর; প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গঠন ইত্যাদি কার্যক্রম দুর্যোগ প্রশমনের আওতাভুক্ত।

পূর্বপ্রস্তুতি (Preparedness): দুর্যোগপূর্ব প্রস্তুতি বলতে দুর্যোপূর্ব সময়ে দুর্যোগের ঝুঁকি কমানোর ব্যবস্থাসমূহকে বোঝায়।আগে থেকে ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চল ও জনগোষ্ঠীকে চিহ্নিতকরণ, দুর্যোগ সংক্রান্তপরিকল্পনা প্রণয়ন, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, জরুরি অবস্থা মোকাবিলার জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদের ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ, ড্রিল বা ভূমিকা অভিনয় এবং রাস্তাঘাট, যানবাহন, বেতার যন্ত্রইত্যাদি দুর্যোগের পূর্বে প্রস্তুত রাখা দুর্যোগ প্রস্তুতির অন্তর্ভুক্ত।

সাড়াদান (Response) : সাড়াদান দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার একটি অংশ মাত্র।দুর্যোগের পরপরই উপযুক্ত সাড়াদানের প্রয়োজন হয়।সাড়াদান বলতে নিরাপদ স্থানে অপসারণ, তল্লাশিওউদ্ধার, ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণ এবং ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমকে বোঝায়।

পুনরুদ্ধার (Recovery) : দুর্যোগে সম্পদ, পরিবেশ, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবকাঠামো ইত্যাদির যে ক্ষতি হয়ে থাকে তা পুনর্নির্মাণের মাধ্যমে দুর্যোগপূর্ব অবস্থায় ফিরিয়ে আনাকেই পুনরুদ্ধার বোঝায়।এক্ষেত্রে সরকারি,অসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সাহায্য ও সহায়তার প্রয়োজন হয়।

উন্নয়ন (Development) : ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাকে দুর্যোগপূর্ব অবস্থায় ফিরিয়ে আনার পরপরই ঐ এলাকার উন্নয়ন কাজে হাত দিতে হয়।উন্নয়ন কর্মকাণ্ড হাতে নেওয়ার পূর্বে ভৌগোলিক ও পরিবেশগত বৈশিষ্ট্যের উপর লক্ষ রাখতে হবে।

উপকূলীয় দুর্যোগ ব্যবস্থা
উপরিউক্ত যে সকল দুর্যোগ সম্পর্কে বলা হলো তার ভিতরে বাংলাদেশের উপকূল অঞ্চলসমূহে ঘূর্ণিঝড়, সুনামি, অন্যদেশের ভূমিকম্পের প্রভাব প্রভৃতির দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।তাই দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জন্য যে সকল পদক্ষেপ নেওয়া হয় তা বেশিরভাগই উপকূলীয় অঞ্চলর জন্য প্রযোজ্য।বাংলাদেশের অন্যান্যঅঞ্চল সাধারণত খরা, নদীভাঙন, বন্যা ও ভূমিকম্প দ্বারা প্রভাবিত হয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন-ঘূর্ণিঝড়, টর্নেডো, খরা, অতিবৃষ্টি ইত্যাদিকে তাৎক্ষণিক মোকাবিলার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হলো আবহাওয়ার তথ্যভিত্তিক সময়মতো পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ। সরকারি আর একটি সংস্থা হচ্ছে স্পরসো।স্পরসো ভূ-উপগ্রহের মাধ্যমে নিয়মিতভাবে মেঘচিত্র সরবরাহ করে আবহাওয়া অধিদপ্তরকে পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণে সহায়তা করছে।আবহাওয়া অধিদপ্তর জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আবহাওয়ার উপাত্ত সংগ্রহ করে, রাডার চিত্র নিয়ে অঙ্কন ও বিশ্লেশনের মাধ্যমে পূর্বাভাস ও আগাম সতর্কীকরণের দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছে।পানি উন্নয়ন বোর্ডের আওতাধীন বন্যা পূর্বাভাস কেন্দ্র বন্যা সংক্রান্তপূর্বাভাস দান ও প্রচারের ব্যবস্থা করে থাকে। জরুরি পরিস্থিতিতে আর্তদের চিকিৎসা, উদ্ধার, ত্রাণ বিতরণ ও পুনর্বাসন কাজে আমাদের সামরিক বাহিনীর সদস্যবৃন্দ বেসামরিক প্রশাসনকে সব রকম সাহায্য ও সহযোগিতা দান করে থাকেন।বাংলাদেশ বেতার ও বাংলাদেশ টেলিভিশন দুর্যোগ সংক্রান্তসংকেতসমূহ প্রচারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।সরকারি প্রচেষ্টার পাশাপাশি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে আমাদের দেশে কর্মরত অসরকারি সংস্থাসমূহ যেমন- অক্সফাম, ডিজাস্টার ফোরাম, কেয়ার বাংলাদেশ, কারিতাস, প্রশিকা, সিসিডিবি, বিডিপিসি (বাংলাদেশ দুর্যোগ প্রস্তুতি কেন্দ্র) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্যঅবদানরাখছে।যথাযথ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং দুর্যোগ মোকাবিলার স্বার্থে আমাদেরকে দুর্যোগ কর্মপরিকল্পনা এবং দুর্যোগ সংক্রান্ত আপদকালীন পরিকল্পনা, ব্যক্তি, পরিবার, গ্রাম, ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে তৈরি করে অনুশীলনের মাধ্যমে এসবের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করা উচিত।